স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

কথোপকথন

স্বামী বিবেকানন্দ

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

১. লণ্ডনে ভারতীয় যোগী.....2
২. ভারতের জীবনব্রত.....6
৩. ভারত ও ইংলণ্ড.....14
৪. ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক.....23
৫. স্বামীজীর সহিত মাদুরায় একঘণ্টা.....27
৬. ভারত ও অন্যান্য দেশের নানা সমস্যা.....33
৭. পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রচার.....43
৮. জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বোধন.....50
৯. ভারতীয় নারী–তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ.....54
১০. হিন্দুধর্মের সীমানা.....60

১. লণ্ডনে ভারতীয় যোগী

[ওয়েষ্টমিনষ্টার গেজেট–২৩ অক্টোবর, ১৮৯৫]

জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে লিখিতেছেনঃ পাশ্চাত্য জাতির নিকটে একপ্রকার সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতীত বেদান্তধর্মের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইনি সত্য-সত্যই একজন ভারতীয় যোগী–যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সন্ন্যাসী ও যোগিগণ শিষ্যপরম্পরাক্রমে যে- শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি অকুতোভয়ে পাশ্চাত্য দেশে আসিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে গত সন্ধ্যায় 'প্রিন্সেস হলে' এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি, মুখের ভাব শান্ত ও প্রসন্ন–তাঁহাকে দেখলেই বোধ হয় তাঁহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ স্বামীজী, আপনার নামের কোন অর্থ আছে কি?–যদি থাকে, তাহা কি আমি জানিতে পারি?

স্বামীজী॥ আমি এখন যে (স্বামী বিবেকানন্দ) নামে পরিচিত, তাহার প্রথম শব্দটির অর্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি বিধিপূর্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়টি একটি উপাধি [নাম?]–সংসারত্যাগের পর ইহা আমি গ্রহণ করিয়াছি। সকল সন্ন্যাসীই এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ–বিবেক অর্থাৎ সদসদ্বিচারের আনন্দ।

'আচ্ছা স্বামীজী, সংসারের সকল লোকে যে-পথে চলিয়া থাকে, আপনি তাহা ত্যাগ করিলেন কেন?'

তবে কি তিনি একটি সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন–আপনি এখন তাহারই প্রতিনিধিস্বরূপ?'

স্বামীজী অমনি উত্তর দিলেন–না না, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে সর্বত্র যে এক গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্যই তাঁহার সমগ্র

জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই, বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীতই করিয়া গিয়াছেন। সাধারণে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনচিন্তাপরায়ণ হয়, এই মতই তিনি পোষণ করিতেন এবং উহার জন্যই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন খুব বড় যোগী ছিলেন।

'তাহা হইলে এই দেশের কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের সহিতই আপনার কোন সম্বন্ধ নাই, যথা–থিওজফিক্যাল সোসাইটি, ক্রিশ্চান সায়েণ্টিষ্টস্১ বা অপর কোন সম্প্রদায়ের সহিত?'

'স্বামীজী স্পষ্ট হৃদয়স্পর্শী স্বরে বলিলেন–না, কিছুমাত্র না। (স্বামীজী যখন কথা কহেন, তখন তাঁহার মুখ বালকের মুখের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে–মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদভাবপূর্ণ!) আমি যাহা শিক্ষা দিই, তাহা আমার গুরুর শিক্ষানুযায়ী, তাঁহার উপদেশের অনুগামী হইয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। অলৌকিক উপায়ে লব্ধ কোনপ্রকার বিষয় শিক্ষা দিবার দাবী আমি করি না। আমার উপদেশের মধ্যে যতটুকু তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিসম্মত এবং ব্যক্তিগণের গ্রাহ্য, ততটুকু লোকে গ্রহণ করিলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইব।

'তিনি বলিতে লাগিলেন–সকল ধর্মেরই লক্ষ্য–কোন বিশেষ মানব-জীবনকে আদর্শস্বরূপ ধরিয়া স্থূলভাবে ভক্তি, জ্ঞান বা যোগ শিক্ষা দেওয়া। উক্ত আদর্শগুলিকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ক যে সাধারণ ভাব ও সাধনপ্রণালী রহিয়াছে, বেদান্ত তাহারই বিজ্ঞানস্বরূপ। আমি ঐ বিজ্ঞানই প্রচার করিয়া থাকি, এবং ঐ বিজ্ঞানসহায়ে নিজ নিজ সাধনার উপায়রূপে অবলম্বিত বিশেষ বিশেষ স্থূল আদর্শগুলি প্রত্যেকে নিজেই বুঝিয়া লউক–এই কথাই বলি। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে বলিয়া থাকি, আর যেখানে কোন গ্রন্থের কথা প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করি, সেখানে বুঝিতে হইবে, চেষ্টা করিলে সেগুলি সংগ্রহ করা যাইতে পারে, আর সকলেই ইচ্ছা করিলে নিজে নিজে উহা পড়িয়া লইতে পারে। সর্বোপরি, প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি দ্বারা আদেশপ্রচারকারী–সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত মহাপুরুষদের

উপদেশ বলিয়া কোন কিছু প্রমাণস্বরূপে উপস্থাপিত করি না, অথবা গোপনীয় গ্রন্থ বা হস্তলিপি হইতে কিছু শিখিয়াছি বলিয়া দাবী করি না। আমি কোন গুপ্ত সমিতির মুখপাত্র নই, অথবা ঐরূপ সমিতিসমূহের দ্বারা কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে বলিয়াও আমার বিশ্বাস নাই। সত্য– আপনিই আপনার প্রমাণ, উহার অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, সত্য অনায়াসে দিবালোক সহ্য করিতে পারে।

তবে স্বামীজী, আপনার কোন সমাজ বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প

স্বামীজী॥ না, আমার কোন প্রকার সমিতি বা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা নাই। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ও সর্বসাধারণের সম্পত্তিস্বরূপ আত্মার তত্ত্ব উপদেশ দিয়া থাকি। জনকয়েক দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভ করিলে ও ঐ জ্ঞান-অবলম্বনে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করিয়া গেলে পূর্ব পূর্ব যুগের ন্যায় এ যুগেও জগৎটাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করিয়া দিতে পারেন। পূর্বকালেও এক এক জন দৃঢ়চিত্ত মহাপুরুষ ঐভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ সময়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন।

‘স্বামীজী, আপনি কি এই সবে ভারত হইতে আসিতেছেন?’ ।

স্বামীজী॥ না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোয় যে ধর্ম-মহাসভা হইয়াছিল, আমি তাহাতে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। সেই অবধি আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিতেছি। মার্কিন জাতি পরম আগ্রহ সহকারে আমার বক্তৃতা শুনিতেছে এবং আমার সহিত পরমবন্ধুবৎ আচরণ করিতেছে। সেদেশে আমার কাজ এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, আমাকে শীঘ্র সেখানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

‘স্বামীজী, পাশ্চাত্য ধর্মসমূহের প্রতি আপনার কিরূপ ভাব?’

আমি এমন একটি দর্শন প্রচার করিয়া থাকি, যাহা জগতে যত প্রকার ধর্ম থাকা সম্ভব, সে-সমুদয়েরই ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে, আর আমার সব ধর্মের উপরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমার উপদেশ কোন ধর্মেরই বিরোধী নয়। আমি ব্যক্তিগত জীবনের

উন্নতিসাধনেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি, ব্যক্তিকেই তেজস্বী করিবার চেষ্টা করি। প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বরাংশ বা ব্রহ্ম—এ কথাই শিক্ষা দিই, আর সর্বসাধারণকে তাহাদের অন্তর্নিহিত এই ব্রহ্মভাব সম্বন্ধে সচেতন হইতেই আহ্বান করিয়া থাকি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহাই প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের আদর্শ।'

'এদেশে আপনার কাজ কি ধরনের হইবে?'

'আমার আশা এই যে, আমি কয়েকজনকে পূর্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দিব, আর তাহাদের নিজ নিজ ভাবে অপরের নিকট উহা ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত করিব। আমার উপদেশ তাহারা যত ইচ্ছা রূপান্তরিত করুক, ক্ষতি নাই। আমি অবশ্য-বিশ্বাস্য মতবাদরূপে কিছু শিক্ষা দিব না, কারণ পরিণামে সত্যের জয় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।'

'আমি প্রকাশ্যে যে-সব কাজ করি, তাহার ভার আমার দু-একটি বন্ধুর হাতে আছে। তাঁহারা ২২ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় পিকাডেলি প্রিন্সেস হলে ইংরেজ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে আমার এক বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। চারিদিকে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। বিষয়—আমার প্রচারিত দর্শনের মূলতত্ত্ব—'আত্মজ্ঞান'।২ তার পর আমার উদ্দেশ্য সফল করিবার যে-পথ দেখিতে পাইব, সেই পথ অনুসরণ করিতে আমি প্রস্তুত; লোকের বৈঠকখানায় বা অন্য স্থলে সভায় যোগ দেওয়া, পত্রের উত্তর দেওয়া বা সাক্ষাৎভাবে বিচার করা—সব কিছুই করিতে আমি প্রস্তুত। এই অর্থলালসা-প্রধান যুগে আমি এই কথাটি কিন্তু সকলকে বলিতে চাই, আমার কোন কার্যই অর্থলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না।'

আমি এইবার তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম—আমার সহিত যত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক মৌলিকভাবপূর্ণ, সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

২. ভারতের জীবনব্রত

[সানডে টাইমস—লণ্ডন, ১৮৯৬]

ইংলণ্ডবাসীরা যে ভারতের ‘প্রবাল উপকূলে’৩ ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। তবে ভারতও যে ইংলণ্ডে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়া থাকেন, তাহা ইংলণ্ডের জনসাধারণ বড় একটা জানেন না। সেণ্ট জর্জেস রোড, সাউথ ওয়েষ্ট, ৬৩নং ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ অল্পকালের জন্য বাস করিতেছেন। দৈবযোগে (যদি ‘দৈব’ এই শব্দটি প্রয়োগ করিতে কেহ আপত্তি না করেন) সেখানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কি করেন, এবং তাঁহার ইংলণ্ডে আসিবার উদ্দেশ্যই বা কি, এই-সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে তাঁহার কোন আপত্তি না থাকায় ঐ স্থানে আসিয়া আমি তাঁহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। তিনি যে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমার সহিত ঐ ভাবে কথোপকথনে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে আমি প্রথমেই বিস্ময় প্রকাশ করিলাম।

তিনি বলিলেন—আমেরিকায় বাস করিবার কাল হইতেই এইরূপে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার সম্পূর্ণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আমার দেশে ঐরূপ প্রথা নাই বলিয়াই যে আমি সর্বসাধারণকে যাহা জানাইতে ইচ্ছা করি, তাহা জানাইবার জন্য বিদেশে গিয়া সেখানকার প্রচারের প্রচলিত প্রথাগুলি অবলম্বন করিব না, ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে যে বিশ্বধর্মমহাসভা বসিয়াছিল, তাহাতে আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। মহীশূরের রাজা এবং অপর কয়েকটি বন্ধু আমাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, আমি আমেরিকায় কিছুটা কৃতকার্য হইয়াছি বলিয়া দাবী করিতে পারি। চিকাগো ছাড়াও আমেরিকার অন্যান্য বড় বড় শহরে আমি বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমেরিকায় বাস করিতেছি। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে একবার ইংলণ্ডে আসিয়াছিলাম, এ বৎসর আসিয়াছি দেখিতেছেন; প্রায় তিন বৎসর আমেরিকায় রহিয়াছি। আমার বিবেচনায়

আমেরিকার সভ্যতা খুব উচ্চ স্তরের। দেখিলাম, মার্কিনজাতির চিত্ত সহজেই নূতন নূতন ভাব ধারণা করিতে পারে। কোন জিনিষ নূতন বলিয়াই তাহারা পরিত্যাগ করে না, উহার বাস্তবিক কোন গুণাগুণ আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে—তারপর উহা গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, বিচার করে।

'ইংলণ্ডের লোকেরা অন্যপ্রকার—ইহাই বুঝি আপনার বলিবার উদ্দেশ্য?'

'হাঁ, ইংলণ্ডের সভ্যতা আমেরিকা হইতে পুরাতন। শতাব্দীর পর শতাব্দী যেমন চলিয়াছে, তেমনই উহাতে নানা নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়া উহার বিকাশ হইয়াছে। ঐরূপে অনেকগুলি কুসংস্কারও আসিয়া জুটিয়াছে। সেগুলি ভাঙিতে হইবে। এখন যে-কোন ব্যক্তি আপনাদের ভিতর কোন নূতন ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাকেই ঐগুলির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।'

'লোকে এইরূপ বলে বটে। আমি যতদূর জানি, তাহাতে আপনি আমেরিকায় কোন নূতন সম্প্রদায় বা ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন নাই।'

' এ কথা সত্য। সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমার ভাবের বিরোধী; কারণ সম্প্রদায় তো যথেষ্টই রহিয়াছে। আর সম্প্রদায় করিতে গেলে উহার তত্ত্বাবধানের জন্য লোক প্রয়োজন। এখন ভাবিয়া দেখুন, যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, অর্থাৎ সাংসারিক পদমর্যাদা, বিষয়সম্পত্তি, নাম প্রভৃতি সব ছাড়িয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা এরূপ কাজের ভার লইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐরূপ কাজ যখন অপরে চালাইতেছে, তখন আবার ঐ ভাবে কাজে অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন।'

'আপনার শিক্ষা কি ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা?'

'সকল প্রকার ধর্মের সারভাগ শিক্ষা দেওয়া বলিলে বরং আমার প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর ধারণা হইতে পারে। ধর্মসমূহের গৌণ অঙ্গগুলি বাদ দিয়া উহাদের মধ্যে

যেটি মুখ্য, যেটি উহাদের মূলভিত্তি, সেইটির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কাজ। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্য, তিনি একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার জীবন ও উপদেশ আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ কোন ধর্মকে কখনও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতেন না; কোন ধর্মের এই এই ভাব ঠিক নয়—এ-কথা তিনি বলিতেন না। তিনি সকল ধর্মের ভাল দিকটাই দেখাইয়া দিতেন। দেখাইতেন, কিরূপে ঐগুলি অনুষ্ঠান করিয়া উপদিষ্ট ভাবগুলিকে আমরা আমাদের জীবনে পরিণত করিতে পারি। কোন ধর্মের বিরোধিতা করা বা তাহার বিপরীত পক্ষ আশ্রয় করা—তাঁহার শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কারণ তাঁহার উপদেশের মূল সত্যই এই যে, সমগ্র জগৎ প্রেমবলে পরিচালিত। আপনারা জানেন, হিন্দুধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই প্রেম ও শান্তিতে বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতে ধর্মসম্বন্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন—জৈনগণ, যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং ঐ বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করে, তাহাদেরও ইচ্ছামত ধর্মানুষ্ঠানে কেহ কোন দিন বাধা দেয় নাই; আজ পর্যন্ত তাহারা ভারতে রহিয়াছে। ভারতই ঐ বিষয়ে শান্তি ও মৃদুতারূপ যথার্থ বীর্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। যুদ্ধ, অসমসাহসিকতা, প্রচণ্ড আঘাতের শক্তি—এগুলি ধর্মজগতে দুর্বলতার চিহ্ন।'

'আপনার কথাগুলি টলস্টয়ের৪ মতের মত লাগিতেছে। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এই মত অনুসরণীয় হইতে পারে; সে-বিষয়েও আমার নিজের সন্দেহ আছে, কিন্তু সমগ্র জাতির ঐ নিয়মে বা আদর্শে কিভাবে চলা সম্ভব?'

'জাতির পক্ষেও ঐ মত অতি উত্তমরূপে কার্যকর হইবে দেখা যায়, ভারতের কর্মফল—ভারতের অদৃষ্ট—অপর জাতিগুলি কর্তৃক বিজিত হওয়া, কিন্তু আবার সময়ে ঐ-সকল বিজেতাকে ধর্মবলে জয় করা। ভারত তাহার মুসলমান বিজেতাগণকে ইতোমধ্যেই জয় করিয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানগণ সকলেই সুফি৫—তাঁহাদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক্ করিবার

উপায় নাই। হিন্দু ভাব তাঁহাদের সভ্যতার মর্মে প্রবেশ করিয়াছে—তাঁহারা ভারতের নিকট শিক্ষার্থীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। মোগল সম্রাট মহাত্মা আকবর কার্যতঃ একজন হিন্দু ছিলেন। আবার ইংলণ্ডের পালা আসিলে ভারত তাহাকেও জয় করিবে। আজ ইংলণ্ডের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, কিন্তু ভাব-জগতে উহার উপযোগিতা তো নাই-ই, বরং উহাতে অপকারই হইয়া থাকে। আপনি জানেন, শোপেনহাওয়ার৬ ভারতীয় ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেনঃ 'অন্ধকার যুগের'৭পর গ্রীক ও ল্যাটিন বিদ্যার অভ্যুদয়ে যেমন ইওরোপে গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল, ভারতীয় ভাব ইওরোপে সুপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইবে।'

'আমায় ক্ষমা করিবেন—কিন্তু সম্প্রতি তো ইহার বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।'

স্বামীজী গম্ভীরভাবে বলিলেন—না দেখা যাইতে পারে, কিন্তু এ-কথাও বেশ বলা যায় যে, ইওরোপের সেই 'জাগরণের'৮সময়ও অনেকে কোন চিহ্ন পূর্বে দেখে নাই, এবং উহা আসিবার পরও উহা যে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। যাঁহারা সময়ের লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত, তাঁহারা কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, একটি মহান্ আন্দোলন আজকাল ভিতরে ভিতরে চলিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বর্ষ ধরিয়া প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধান অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে ইহা পণ্ডিতদের হস্তেই রহিয়াছে এবং তাঁহারা যতদূর কার্য করিয়াছেন, তাহা লোকের নিকট শুষ্ক নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু ক্রমে লোকে উহা বুঝিবে, ক্রমে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হইবে।

'আপনার মতে তবে ভারতই ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ বিজেতার আসন পাইবে! তথাপি ভারত তাহার ভাবরাজি-প্রচারের জন্য অন্যান্য দেশে অধিক ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করে না কেন? বোধ করি, যত দিন না সমগ্র জগৎ আসিয়া তাহার পদতলে পড়িতেছে, ততদিন সে অপেক্ষা করিবে!'

'ভারত প্রাচীন যুগে ধর্মপ্রচারকার্যে একটি প্রবল শক্তি হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ড খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার শত শত বৎসর পূর্বে বুদ্ধ সমগ্র এশিয়াকে তাঁহার মতাবলম্বী করিবার জন্য

ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। বর্তমানকালে চিন্তাজগৎ ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ করিতেছে। এখন ইহার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বিশেষ কোনপ্রকার ধর্ম অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যা খুব বাড়িতেছে, আর শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভিতরেই এই ভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকাতে যে লোক-গণনা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক লোক আপনাদিগকে কোনরূপ বিশেষ ধর্মাবলম্বী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। আমি বলি, সকল ধর্মসম্প্রদায়ই এক মূল সত্যের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। হয় সবগুলিরই উন্নতি হইবে, নয় সবগুলিই বিনষ্ট হইবে। উহারা ঐ এক সত্যরূপ কেন্দ্র হইতে বহু ব্যাসার্ধের মত বাহির হইয়াছে, এবং বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মানব-মনের উপযোগী সত্যের প্রকাশস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।'

'এখন আমরা অনেকটা মূলপ্রসঙ্গের কাছে আসিতেছি—সেই কেন্দ্রীভূত সত্য কি?'

'মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিই—সে যতই মন্দপ্রকৃতি হউক না কেন, ভগবানের প্রকাশস্বরূপ। এই ব্রহ্মশক্তি আবৃত থাকে, মানুষের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত থাকে। ঐ কথায় আমার ভারতীয় সিপাহীবিদ্রোহের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ঐ সময়ে বহুবর্ষ-মৌনব্রতধারী এক সন্ন্যাসীকে জনৈক মুসলমান দারুণ আঘাত করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লোকে ঐ আঘাতকারীকে ধরিয়া তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিল, 'স্বামিন্, আপনি একবার বলুন, তাহা হইলে এ ব্যক্তি নিহত হইবে।' সন্ন্যাসী অনেক দিনের মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, 'বৎসগণ, তোমরা বড়ই ভুল করিতেছ—ঐ ব্যক্তিও যে সাক্ষাৎ ভগবান্!' সকলের পশ্চাতে ঐ একত্ব রহিয়াছে—উহাই আমাদের জীবনের শিক্ষা করিবার প্রধান বিষয়। তাঁহাকে গড্, আল্লা, যিহোবা, প্রেম বা আত্মা যাহাই বলুন না কেন, সেই এক বস্তুই অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে মহত্তম মানব পর্যন্ত সমুদয় প্রাণীতেই প্রাণস্বরূপে বিরাজমান। এই চিত্রটি মনে মনে ভাবুন দেখি, যেন বরফে ঢাকা সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের গর্ত করা রহিয়াছে—ঐ প্রত্যেকটি গর্তই এক একটি আত্মা—এক একটি মানুষসদৃশ, নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির তারতম্য অনুসারে বন্ধন কাটাইয়া—ঐ বরফ ভাঙিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে!'

‘আমার বোধ হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির আদর্শের মধ্যে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। আপনারা সন্ন্যাস, একাগ্রতা প্রভৃতি উপায়ে খুব উন্নত ব্যক্তি গঠনের চেষ্টা করিতেছেন, আর পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ—সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণতা সাধন করা। সেইজন্য আমরা সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যাসমূহের মীমাংসাতেই বিশেষ ভাবে নিযুক্ত; কারণ সর্বসাধারণের কল্যাণের উপর আমাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে—আমরা এইরূপ বিবেচনা করি।’

স্বামীজী খুব দৃঢ়তা ও আগ্রহের সহিত বলিলেন, ‘কিন্তু সামাজিক বা রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ের সফলতার মূলভিত্তি—মানুষের সততা। পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইন দ্বারা কখনও কোন জাতি উন্নত বা ভাল হয় না, কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতির ভাল হইয়া থাকে। আমি চীনদেশে গিয়াছিলাম—এক সময়ে ঐ জাতিই সর্বাপেক্ষা চমৎকার শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ সেই চীন ছত্রভঙ্গ কতকগুলি সামান্য লোকের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ—প্রাচীনকালে উদ্ভাবিত ঐ-সকল শাসনপ্রণালী পরিচালনা করিবার উপযুক্ত লোক বর্তমানে ঐ জাতিতে আর জন্মাইতেছে না। ধর্ম সকল-বিষয়ের মূল পর্যন্ত গিয়া থাকে। মূলটি যদি ঠিক থাকে, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক থাকে।’

‘ভগবান্ সকলেরই ভিতর রহিয়াছেন, কিন্তু, তিনি আবৃত রহিয়াছেন—এ কথাটা যেন কি রকম অস্পষ্ট ও ব্যবহারিক জগৎ হইতে অনেক দূরে বলিয়া বোধ হয়। লোকে তো আর সদা-সর্বদা ঐ ব্রহ্মের সন্ধান করিতে পারে না?’

‘ লোকে অনেক সময় পরস্পর একই উদ্দেশ্যে কার্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে না। এটি স্বীকার করিতেই হইবে যে, আইন গভর্ণমেণ্ট রাজনীতি—এগুলি মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। ঐ-সকল ছাড়াইয়া উহাদের চরম লক্ষ্যস্থল এমন একটি আছে, যেখানে আইন আর প্রয়োজন হয় না। এখানে বলিয়া রাখি, সন্ন্যাসী শব্দটির অর্থ—বিধিনিয়মত্যাগী ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষী, কিম্বা ‘সন্ন্যাসী’ বলিতে নেতিবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীও বলিতে পারা যায়। তবে এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ভুল ধারণা আসিয়া

থাকে। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ একই শিক্ষা দিয়া থাকেন। যীশুখ্রীষ্ট বুঝিয়াছিলেন, নিয়ম-প্রতিপালনই উন্নতির মূল নহে, যথার্থ পবিত্রতা ও চরিত্রই শক্তি। আপনি যে বলিতেছিলেন, প্রাচ্যদেশে লক্ষ্য আত্মার উচ্চতর বিকাশের দিকে—অবশ্য আপনি এ-কথা বিস্মৃত হন নাই বোধ হয় যে, আত্মা দুই প্রকারঃ কূটস্থ চৈতন্য, যিনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ; আর আভাস চৈতন্য, আপাততঃ যাহাকে আমাদের আত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে।'

'বোধ হয়, আপনার ভাব এই যে, আমরা আভাসের উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছি, আর আপনার প্রকৃত চৈতন্যের উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছেন?'

'মন নিজ পূর্ণতর বিকাশের জন্য নানা সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। প্রথমে উহা স্থূলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে যাইতে থাকে। আরও দেখুন, সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ধারণা মানুষে কিরূপে লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ উহা সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাবের আকারে আবির্ভূত হয়, তখন উহাতে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ—'অপরকে বাদ দেওয়া' ভাব থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে আমরা উদারতর ভাবে—সূক্ষ্মতর ভাবে পৌঁছিয়া থাকি।'

'তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, এই-সব সম্প্রদায়, যাহা আমরা—ইংরেজেরা—এত ভালবাসি, সব লোপ পাইবে? আপনি জানেন বোধ হয়, জনৈক ফরাসী বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে সম্প্রদায় সহস্র সহস্র, কিন্তু সার জিনিষ খুব অল্প।'

'ঐ-সব সম্প্রদায় যে লোপ পাইবে, সে-সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। উহাদের অস্তিত্ব অসার বা গৌণ কতকগুলি বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য উহাদের মুখ্য বা সার ভাবটি থাকিয়া যাইবে এবং উহার সাহায্যে অপর নূতন গৃহ নির্মিত হইবে। অবশ্য সেই প্রাচীন উক্তি আপনার জানা আছে যে, একটা চার্চ বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে জন্মান ভাল, কিন্তু আমরণ উহার গণ্ডীর ভিতরে বদ্ধ থাকা ভাল নয়।'

'ইংলণ্ডে আপনার কার্যের কিরূপ বিস্তার হইতেছে, অনুগ্রহপূর্বক বলিবেন কি?'

‘ ধীরে ধীরে হইতেছে, ইহার কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি। যেখানে মূল ধরিয়া কার্য, সেখানে প্রকৃত উন্নত বা বিস্তার অবশ্যই ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। অবশ্য বলা বাহুল্য, যে-কোন উপায়েই হউক, এই-সব ভাব বিস্তৃত হইবেই হইবে, এবং আমাদের অনেকের বোধ হইতেছে, ঐ-সকল ভাব-প্রচারের যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে।’

৩. ভারত ও ইংলণ্ড

['ইণ্ডিয়া', লণ্ডন, ১৮৯৬]

লণ্ডনের ইহা মরসুমের সময়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মত ও দর্শনে আকৃষ্ট অনেক ব্যক্তির সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সামরিক বাসস্থান দক্ষিণ বেলগ্রেভিয়াতে গেলাম। ভারতের আবার ইংলণ্ডকে বলিবার কি আছে, জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল।

স্বামীজী শান্তভাবে বলিলেন—ভারতের পক্ষে এখানে ধর্মপ্রচারক-প্রেরণ কিছু নূতন ব্যাপার নহে। যখন বৌদ্ধধর্ম নবীন তেজে উঠিতেছিল—যখন ভারতের চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিগুলিকে তাহার কিছু শিখাইবার ছিল, তখন সম্রাট অশোক চারিদিকে ধর্মপ্রচারক পাঠাইলেন।

'আচ্ছা, এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কেন ভারত ঐরূপে ধর্মপ্রচারক-প্রেরণ বন্ধ করিয়াছিল, আবার কেনই বা এখন আরম্ভ করিল?'

'বন্ধ করিবার কারণ—ক্রমশঃ স্বার্থপর হইয়া ভারত এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল যে, আদানপ্রাদান-প্রণালীক্রমেই ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েই জীবিত থাকে ও উন্নতি লাভ করে। ভারত চিরদিন জগতে একই বার্তা বহন করিয়াছে; ভারতের বার্তা আধ্যাত্মিক। অনন্ত যুগ ধরিয়া অন্তরের ভাবরাজ্যেই তাহার একচেটিয়া অধিকার; সূক্ষ্ম বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র—ইহাতেই ভারতের বিশেষ অধিকার। প্রকৃতপক্ষে আমার ইংলণ্ডে প্রচারকার্যে আগমন—ইংলণ্ডের ভারত-গমনেরই ফলস্বরূপ। ইংলণ্ড ভারতকে জয় করিয়া শাসন করিতেছে, তাহার পদার্থবিদ্যা নিজের ও আমাদের কাজে লাগাইতেছে। ভারত জগৎকে কি দিয়াছে ও কি দিতে পারে, মোটামুটি বলিতে গিয়া আমার একটি সংস্কৃত ও একটি ইংরেজী বাক্য মনে পড়িতেছে।

কোন মানুষ মরিয়া গেলে আপনারা বলেন, সে আত্মা পরিত্যাগ করিল (He gave up the ghost); আর আমরা বলি, সে দেহত্যাগ করিল। আপনারা বলিয়া থাকেন, মানুষের আত্মা আছে, তাহা দ্বারা আপনারা যেন অনেকটা ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শরীরটাই মানুষের প্রধান জিনিষ। কিন্তু আমরা বলি, মানুষ আত্মাস্বরূপ—তাহার একটা দেহ আছে। এগুলি অবশ্য জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের উপরিভাগের ক্ষুদ্র বুদ্বুদমাত্র, কিন্তু ইহাই আপনাদের জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের গতি প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

‘ আমার ইচ্ছা হইতেছে, আপনাকে শোপেনহাওয়ারের ভবিষ্যদ্বাণীটি স্মরণ করাইয়া দিই যে, অন্ধকার যুগের (Dark Ages) অবসানে গ্রীক ও ল্যাটিন বিদ্যার অভ্যুদয়ে ইওরোপে যেরূপ গুরুতর পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয় দর্শন ইওরোপে সুপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন আসিবে। প্রাচ্যতত্ত্ব-গবেষণা খুব প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছে।

সত্যান্বেষিগণের সমক্ষে নূতন ভাবস্রোতের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে।

’

‘তবে কি আপনি বলিতে চান, ভারতই অবশেষে তাহার বিজেতাকে জয় করিবে?’

‘হাঁ, ভাবরাজ্যে। এখন ইংলণ্ডের হাতে তরবারি—সে এখন জড়জগতের প্রভু, যেমন ইংরেজের আগে আমাদের মুসলমান বিজেতারা ছিলেন। সম্রাট আকবর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন হিন্দুই হইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে—সুফীদের সঙ্গে—হিন্দুদের সহজে প্রভেদ করা যায় না। তাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে আমাদের আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী আমাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।’

‘তাহা হইলে আপনার মতে—দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজের অদৃষ্টেও ঐরূপ হইবে? বর্তমান মুহূর্তে ঐ ভবিষ্যৎ কিন্তু অনেক দূরে বলিয়াই বোধ হয়।’

‘না, আপনি যতদূর ভাবিতেছেন, ততদূর নয়। ধর্মবিষয়ে হিন্দু ও ইংরেজের ভাব অনেক বিষয়ে সদৃশ। আর অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে হিন্দুর ঐক্য আছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যদি কোন ইংরেজ শাসনকর্তার (Civil Servant) ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকে, তবে দেখা যায়, উহাই তাঁহার হিন্দুর প্রতি সহানুভূতির কারণ। ঐ সহানুভূতির ভাব দিন দিন বাড়িতেছে। কতকগুলি লোক যে এখনও ভারতীয় ভাবকে অতি সঙ্কীর্ণ—এমন কি, কখনও কখনও অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, কেবল অজ্ঞানই যে তাহার কারণ, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হইবে না।’

‘হাঁ, ইহা অজ্ঞতার পরিচায়ক বটে। আপনি ইংলণ্ডে না আসিয়া যে আমেরিকায় ধর্মপ্রচারকার্যে গেলেন, ইহার কারণ কি বলিবেন?’

‘সেটি কেবল দৈবঘটনা মাত্র—বিশ্বধর্ম-মহাসভা লণ্ডনে না বসিয়া চিকাগোয় বসিয়াছিল বলিয়াই আমাকে সেখানে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক লণ্ডনেই উহার অধিবেশন হওয়া উচিত ছিল। মহীশূরের রাজা এবং আর কয়েকজন বন্ধু আমাকে সেখানে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেখানে তিন বৎসর ছিলাম—কেবল গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি লণ্ডনে বক্তৃতা দিবার জন্য আসিয়াছিলাম এবং এই গ্রীষ্মেও আসিয়াছি। মার্কিনেরা খুব বড় জাত—উহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমি তাহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তাহাদের মধ্যে আমি অনেক সহৃদয় বন্ধু পাইয়াছি। ইংরেজদের অপেক্ষা তাহাদের কুসংস্কার অল্প, তাহারা সকল নূতন ভাবকেই ওজন করিয়া দেখিতে বা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত—নূতনত্ব সত্ত্বেও উহার আদর করিতে প্রস্তুত। তাহারা খুব অতিথিপরায়ণ। লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতে সেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগে। আমার মত আপনিও আমেরিকার শহরে শহরে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন—সর্বত্রই বন্ধু জুটিবে। আমি বষ্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ডেসমোনিস, মেমফিস এবং অন্যান্য অনেক স্থানে গিয়াছিলাম।

’

‘আর প্রত্যেক জায়গায় শিষ্য করিয়া আসিয়াছেন?’

‘হাঁ, শিষ্য করিয়া আসিয়াছি–কিন্তু কোন সমাজ গঠন করি নাই। উহা আমার কাজের অন্তর্গত নহে। সমাজ বা সমিতি তো যথেষ্টই অছে। তা ছাড়া সম্প্রদায় করিলে উহা পরিচালনার জন্য আবার লোক দরকার–সম্প্রদায় গঠিত হইলেই টাকার প্রয়োজন, ক্ষমতার প্রয়োজন, মুরুব্বির প্রয়োজন। অনেক সময় সম্প্রদায়সমূহ প্রভুত্বের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, কখনও কখনও অপরের সহিত লড়াই পর্যন্ত করিয়া থাকে।’

‘তবে কি আপনার ধর্মপ্রচারকার্যের ভাব সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, আপনি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তাহারই প্রচার করিতে চাহেন?’

‘ আমি প্রচার করিতে চাই–ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির যাহা সার, তাহাই আমি প্রচার করিতে চাই। সকল ধর্মেরই একটা মুখ্য ও একটা গৌণ ভাগ আছে। ঐ গৌণভাগগুলি ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে, তাহাই সকল ধর্মের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ, উহাই সকল ধর্মের সাধারণ সম্পত্তি। সকল ধর্মের অন্তরালে ঐ একত্ব রহিয়াছে–আমরা উহাকে গড্, আল্লা, যিহোবা, আত্মা, প্রেম–যে কোন নাম দিতে পারি। সেই এক সত্তাই সকল প্রাণীর প্রাণরূপে বিরাজিত–প্রাণিজগতের অতি নিকৃষ্ট বিকাশ হইতে সর্বোচ্চ বিকাশ মানব পর্যন্ত সর্বত্র। আমরা ঐ একত্বের দিকেই সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই, কিন্তু পাশ্চাত্যে–শুধু পাশ্চাত্যে কেন, সর্বত্রই লোকে গৌণবিষয়গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়া থাকে। লোকে ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি লইয়া অপরকে ঠিক নিজের মত কাজ করাইবার জন্যই পরস্পরের সহিত বিবাদ এবং পরস্পরকে হত্যা পর্যন্ত করে। ভগবদ্ভক্তি ও মানব-প্রীতিই যখন জীবনের সার বস্তু, তখন এইসকল বাদ-বিসংবাদকে কঠিনতর ভাষায় নির্দেশ না করিলেও আশ্চর্য ব্যাপার বলিতে হয়।’

‘আমার বোধ হয়, হিন্দু কখনও অন্য ধর্মাবলম্বীর উপর উৎপীড়ন করিতে পারে না।’

‘এ পর্যন্ত কখনও করে নাই। জগতে যত জাতি আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা পরধর্মসহিষ্ণু। হিন্দু গভীর ধর্মভাবাপন্ন বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তির উপর সে অত্যাচার করিবে। কিন্তু দেখুন, জৈনেরা ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন হিন্দুই জৈনদের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।’

‘ইংলণ্ডে এই অদ্বৈত মতবাদ কিরূপে প্রসার লাভ করিতেছে? এখানে তো সহস্র সহস্র সম্প্রদায়।’

স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে ধীরে ধীরে ঐগুলি লোপ পাইবে। উহারা গৌণবিষয় অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য স্বভাবতই চিরকাল থাকিতে পারে না। ঐ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। ঐ উদ্দেশ্য—সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের ধারণানুযায়ী সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। এখন ঐ-সকল বিভিন্ন ব্যক্তি-সমষ্টির মধ্যে যে ভেদরূপ প্রাচীর—ব্যবধান আছে, সেগুলি ভাঙিয়া দিয়া ক্রমে আমরা সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবে পৌঁছিতে পারি। ইংলণ্ডে এই কাজ খুব ধীরে ধীরে চলিতেছে, তাহার কারণ সম্ভবতঃ এখনও উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই ভাব প্রসারিত হইতেছে। ইংলণ্ডও ভারতে ঐ কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে, আমি আপনার দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। উহা সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডী কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।’

‘কিন্তু কতক ইংরেজ—আর তাঁহারা ভারতের প্রতি কম সহানুভূতিসম্পন্ন নন, কিম্বা উহার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব অজ্ঞ নন—জাতিভেদকে মুখ্যতঃ কল্যাণকর বলিয়াই মনে করেন। লোকে সহজেই বেশী রকম ইওরোপীয়-ভাবাপন্ন হইয়া যাইতে পারে। আপনিই আমাদের অনেকগুলি আদর্শকে জড়বাদাত্মক বলিয়া নিন্দা করেন।’

‘সত্য। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভারতকে ইংলণ্ডে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন না। দেহের অন্তরালে যে চিন্তা রহিয়াছে, তাহা দ্বারাই এই শরীর গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র জাতিটি জাতীয় চিন্তার বিকাশমাত্র, আর ভারতে উহা সহস্র সহস্র বৎসরের চিন্তার বিকাশ-স্বরূপ। সুতরাং ভারতকে ইওরোপীয়-ভাবাপন্ন করা এক অসম্ভব ব্যাপার এবং উহার জন্য চেষ্টা করাও নির্বোধের কাজ। ভারতে চিরদিনই সামাজিক উন্নতির উপাদান বিদ্যমান ছিল; যখনই শান্তিপূর্ণ শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছে, তখনই উহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপনিষদের যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের সকল বড় বড় আচার্যই জাতিভেদের বেড়া ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য মূল জাতিবিভাগকে নহে, উহার বিকৃত ও অবনত ভাবটাকেই তাঁহারা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাতিবিভাগে অতি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা ছিল—বর্তমান জাতিভেদের মধ্যে যেটুকু ভাল দেখিতে পাইতেছেন, তাহা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইতেই আসিয়াছে। বুদ্ধ জাতিবিভাগকে উহার প্রাচীন মৌলিক আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারত যখনই জাগিয়াছে, তখনই জাতিভেদ ভাঙিবার প্রবল চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগকেই চিরকাল এ কাজ করিতে হইবে—আমাদিগকেই প্রাচীন ভারতের পরিণতি ও ক্রমবিকাশ-কল্পে নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে; যে-কোন বৈদেশিক ভাব ঐ কাজে সাহায্য করে, তাহা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তাহা নিজের করিয়া লইতে হইবে। অপরে কখনও আমাদের হইয়া ঐ কাজ করিতে পারিবে না। সকল উন্নতিই ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের ভিতর হইতে হওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ড কেবল ভারতকে তাহার নিজ উদ্ধার-সাধনে সাহায্য করিতে পারে—এই পর্যন্ত! আমার মতে যে-জাতি ভারতের গলা টিপিয়া রহিয়াছে, তাহার নির্দেশে যে-উন্নতি হইবে, তাহার কোন মূল্য নাই। ক্রীতদাসের ভাবে কার্য করিলে অতি উচ্চতম কার্যেরও ফলে অবনতিই ঘটিয়া থাকে।’

‘আপনি কি ভারতের জাতীয় মহাসমিতি আন্দোলনের (Indian National Congress Movement) দিকে কখনও মনোযোগ দিয়াছেন?’

‘আমি যে ও-বিষয়ে বিশেষ মন দিয়াছি, বলিতে পারি না। আমার কার্যক্ষেত্র অন্য বিভাগে। কিন্তু আমি ঐ আন্দোলন দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফল লাভের সম্ভাবনা আছে মনে করি এবং অন্তরের সহিত উহার সিদ্ধি কামনা করি। ভারতের বিভিন্ন জাতি লইয়া এক বৃহৎ জাতি বা নেশন গঠিত হইতেছে। আমার কখনও কখনও মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন জাতি ইওরোপের বিভিন্ন জাতি অপেক্ষা কম বিচিত্র নয়। অতীতে ইওরোপের বিভিন্ন জাতি ভারতীয় বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, আর এই ভারতীয় বাণিজ্য জগতের সভ্যতা-বিস্তারের একটি প্রবল শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে। এই ভারতীয় বাণিজ্যাধিকার-লাভ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে একরূপ ভাগ্যচক্র-পরিবর্তনকারী ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ ক্রমান্বয়ে উহার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। ভিনিসবাসীরা প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য-বিস্তারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সুদূর পাশ্চাত্যে ঐ ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করাতেই যে আমেরিকার আবিষ্কার হইল, ইহাও বলা যাইতে পারে।’

‘ইহার পরিণতি কোথায়?’

‘অবশ্য ইহার পরিণতি হইবে ভারতের মধ্যে সাম্যভাব-স্থাপনে, সকল ভারতবাসীর ব্যক্তিগত সমান অধিকারলাভে। জ্ঞান কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না, উহা উচ্চশ্রেণী হইতে ক্রমে নিম্নশ্রেণীতে বিস্তৃত হইবে। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে, পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত হইবে। ভারতীয় সর্বসাধারণের মধ্যে নিহিত অগাধ কার্যকরী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে, উহাকে জাগাইতে হইবে।

’

‘প্রবল যুদ্ধকুশল জাতি না হইয়া কি কেহ কখনও বড় হইয়াছে?’ স্বামীজী মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, ‘হাঁ, চীন হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে আমি চীন ও জাপানে ভ্রমণ করিয়াছি। আজ চীন একটা ছত্রভঙ্গ দলের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু

উন্নতির দিনে উহার যেমন সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা ছিল, আর কোন জাতির এ পর্যন্ত সেরূপ হয় নাই। অনেক বিষয়—যেগুলিকে আমরা আজকাল 'আধুনিক' বলিয়া থাকি, চীনে শত শত—এমন কি বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সেগুলি প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার কথা ধরুন।'

'চীন এমন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল কেন?'

'কারণ, চীন তাহার সামাজিক প্রথা অনুযায়ী মানুষ তৈয়ার করিতে পারিল না। আপনাদের একটা চলিত কথা আছে যে, পার্লামেণ্টের আইনবলে মানুষকে ধার্মিক করিতে পারা যায় না। চীনারা আপনাদের পূর্বেই ঐ কথা ঠেকিয়া শিখিয়াছিল। ঐ কারণেই রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের আবশ্যকতা গভীরতর। কারণ ধর্ম ব্যবহারিক জীবনের মূলতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করে।'

'আপনি যে ভারতের জাগরণের কথা বলিতেছেন, ভারত কি সে-বিষয়ে সচেতন?'

'সম্পূর্ণ সচেতন। সকলে সম্ভবতঃ কংগ্রেস আন্দোলনে এবং সমাজসংস্কার-ক্ষেত্রে এই জাগরণ বেশীর ভাগ দেখিয়া থাকে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে কাজ চলিলেও ধর্মবিষয়ে ঐ জাগরণ বাস্তবিকই হইয়াছে।'

'পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের আদর্শ এতদূর বিভিন্ন। আমাদের আদর্শ—সামাজিক অবস্থার পূর্ণতা-সাধন বলিয়াই বোধ হয়। আমরা এখন এই-সকল বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি, আর প্রাচ্যবাসিগণ সেই সময়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের ধ্যানে নিযুক্ত। সুদান-যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের ব্যয়ভার কোথা হইতে নির্বাহ হইবে, এই বিষয়ের বিচারেই এখানে পার্লামেণ্ট ব্যস্ত। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভদ্র সংবাদপত্র-মাত্রেই সরকারের অন্যায় মীমাংসার বিরুদ্ধে খুব চীৎকার করিতেছে, কিন্তু আপনি হয়তো ভাবিতেছেন, ও-বিষয়টা একেবারে মনোযোগেরই যোগ্য নয়।'

স্বামীজী সম্মুখের সংবাদপত্রটি লইয়া এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাগজ হইতে উদ্ধৃতাংশসমূহে একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, 'কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার সহানুভূতি স্বভাবতই আমার দেশের সহিত হইবে। তথাপি ইহাতে আমার একটি সংস্কৃত প্রবাদ মনে পড়িতেছেঃ হাতী বেচিয়া এখন আর অঙ্কুশের জন্য বিবাদ কেন? ভারতই চিরকাল দিয়াই আসিতেছে। রাজনীতিকদের বিবাদ বড় অদ্ভুত। রাজনীতির ভিতর ধর্ম ঢুকাইতে এখনও অনেক যুগ লাগিবে।'

'তাহা হইলেও উহার জন্য অতি শীঘ্র চেষ্টা করা তো আবশ্যক?'

'হাঁ, জগতের মধ্যে বৃহত্তম শাসনযন্ত্র সুমহান্ লণ্ডনের হৃদয়ের কোন ভাববীজ রোপণ করা বিশেষ প্রয়োজন বটে। আমি অনেক সময় ইহার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকি—কিরূপ তেজের সহিত ও কেমন সম্পূর্ণভাবে অতি সূক্ষ্মতম শিরায় পর্যন্ত উহার ভাবপ্রবাহ ছুটিয়াছে! উহার ভাববিস্তার—চারিদিকে শক্তিসঞ্চালনপ্রণালী কি অদ্ভুত! ইহা দেখিলে সমগ্র সাম্রাজ্যটি কত বৃহৎ ও উহার কার্য কত গুরুতর, তাহা বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হয়। অন্যান্য বিষয়-বিস্তারের সহিত উহার ভাবও ছড়াইয়া থাকে। এই মহান্ যন্ত্রের কেন্দ্রে কতকগুলি ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে অতি দূরবর্তী দেশে পর্যন্ত ঐগুলি সঞ্চারিত হইতে পারে।'

৪. ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক

[লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ‘একো নামক সংবাদপত্র, ১৮৯৬]

... বোধ হয় নিজের দেশে হইলে স্বামীজী গাছতলায়, বড়জোর কোন মন্দিরের সন্নিকটে থাকিতেন, নিজের দেশের কাপড় পরিতেন ও তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত থাকিত। কিন্তু লণ্ডনে তিনি ও-সব কিছুই করেন না। সুতরাং আমি যখন স্বামীজীর সহিত দেখা করিলাম, দেখিলাম—তিনি অপরাপর লোকের মতই বাস করিতেছেন। পোষাকও অন্যান্য লোকেরই মত—তফাত কেবল এই যে, তিনি গেরুয়া রঙের একটি লম্বা জামা পরেন।

আমি প্রথমেই ঐ ভারতীয় যোগীকে তাঁহার নাম খুব ধীরে ধীরে বানান করিতে বলিলাম।

* * *

‘আপনি কি মনে করেন, আজকাল লোকের অসার ও গৌণ বিষয়েই দৃষ্টি বেশি?’

‘আমার তো তাই মনে হয়—অনুন্নত জাতিদের মধ্যে এবং পাশ্চাত্য দেশের সভ্য জাতিদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত, তাদের মধ্যেও এই ভাব। আপনার প্রশ্নের ভাবে বোধ হয়, ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্য ভাব। বাস্তবিক তাই বটে। ধনী লোকেরা হয় ঐশ্বর্যভোগে মগ্ন, অথবা আরও অধিক ধন-সঞ্চয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত। তারা এবং সংসারকর্মে ব্যস্ত অনেক লোকে ধর্মটাকে একটা অনর্থক বাজে জিনিষ মনে করে, আর সরল ভাবেই এ-কথা মনে করে থাকে। প্রচলিত ধর্ম হচ্ছে—দেশহিতৈষিতা আর লোকাচার। লোকে বিবাহের সময় বা কাকেও কবর দেবার সময়েই কেবল চার্চে যায়।’

‘ আপনি যা প্রচার করছেন, তার ফলে কি লোকের চার্চে গতিবিধি বাড়বে?‘

‘আমার তো তা বোধ হয় না। কারণ বাহ্য অনুষ্ঠান বা মতবাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মই যে মানবজীবনের সর্বস্ব এবং সব কিছুর ভেতরেই যে ধর্ম আছে, তাই দেখান

আমার জীবনব্রত। ... আর এখানে ইংলণ্ডে কি ভাব চলছে? ভাবগতিক দেখে বোধ হয় যে, সোশ্যালিজম্ বা অন্য কোনরূপ গণতন্ত্র, তার নাম যাই দিন না কেন, শীঘ্র প্রচলিত হবে। লোকে অবশ্য তাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চাইবে। তারা চাইবে—যাতে তাদের কাজ পূর্বাপেক্ষা কমে যায়, যাতে তারা ভাল খেতে পায় এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু যদি এদেশের সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা ধর্মের উপর, মানবের সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা যে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি? এটি নিশ্চয় জানবেন যে, ধর্ম সকল বিষয়ের মূল পর্যন্ত গিয়ে থাকে। যদি ঐটি ঠিক থাকে, তবে সব ঠিক। '

'কিন্তু ধর্মের সার দার্শনিক ভাব লোকের মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া তো বড় সহজ ব্যাপার নয়। লোকে সচরাচর যে-সকল চিন্তা করে এবং যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তার সঙ্গে তো এর অনেক ব্যবধান।'

'সকল ধর্ম বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় লোকে ক্ষুদ্রতর সত্যকে আশ্রয় করে থাকে, পরে তা থেকেই বৃহত্তর সত্যে উপনীত হয়; সুতরাং অসত্য ছেড়ে সত্যলাভ হল, এটি বলা ঠিক নয়। সৃষ্টির অন্তরালে এক বস্তু বিরাজমান, কিন্তু লোকের মন নিতান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য বস্তু একটিই, জ্ঞানিগণ তাকে নানারূপে বর্ণনা করে থাকেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সঙ্কীর্ণতর সত্য থেকে ব্যাপকতর সত্যে অগ্রসর হয়ে থাকে; সুতরাং অপরিণত বা নিম্নতর ধর্মসমূহও মিথ্যা নয়, সত্য; তবে তাদের মধ্যে সত্যের ধারণা বা অনুভূতি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বা অপকৃষ্ট—এই মাত্র। লোকের জ্ঞানবিকাশ ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। এমন কি, ভূতোপাসনা পর্যন্ত সেই নিত্য সত্য সনাতন ব্রহ্মেরই বিকৃত উপাসনা মাত্র। ধর্মের অন্যান্য যে-সব রূপ আছে, তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর সত্য বর্তমান; সত্য কোন ধর্মেই পূর্ণরূপে নেই।'

'আপনি ইংলণ্ডে যে ধর্ম প্রচার করতে এসেছেন, তা আপনারই উদ্ভাবিত কিনা, এ- কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

‘এ ধর্ম আমার উদ্ভাবিত কখনই নয়। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক জনৈক ভারতীয় মহাপুরুষের শিষ্য। আমাদের দেশের অনেক মহাত্মার মত তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু অতিশয় পবিত্রাত্মা ছিলেন এবং তাঁহার জীবন ও উপদেশ বেদান্তদর্শনের ভাবে বিশেষরূপে অনুরঞ্জিত ছিল। বেদান্তদর্শন বললাম—কিন্তু এটিকে ধর্মও বলতে পারা যায়, কারণ প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত ‘ধর্ম’ ও ‘দর্শন’ দুই-ই। সম্প্রতি ‘নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরি’ পত্রের একটি সংখ্যায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার আমার আচার্যদেবের যে বিবরণ লিখেছেন, তা অনুগ্রহপূর্বক পড়ে দেখবেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়, আর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগ হয়। কেশবচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য ব্যক্তির জীবনের উপর তিনি প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শরীর ও মনের সংযম অভ্যাস করে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তাঁর মুখভাব সাধারণ মানুষের মত ছিল না—তাঁর মুখে বালকের মত কমনীয়তা, গভীর নম্রতা এবং অদ্ভুত প্রশান্ত ও মধুর ভাব দেখা যেত। তাঁর মুখ দেখে বিচলিত না হয়ে কেউ থাকতে পারত না।’

‘তবে আপনার উপদেশ বেদ হইতে গৃহীত?’

‘হাঁ, বেদান্তের অর্থ বেদের শেষভাগ, উহা বেদের তৃতীয় অংশ। উহার নাম উপনিষদ্। প্রাচীন ভাগে যে-সকল ভাব বীজাকারে অবস্থিত দেখতে পাওয়া যায়, সেই বীজগুলিই এখানে সুপরিণত হয়েছে। বেদের অতি প্রাচীন ভাগের নাম ‘সংহিতা’। এগুলি অতি প্রাচীন ধরনের সংস্কৃতে রচিত। যাস্কের ‘নিরুক্ত’ নামক অতি প্রাচীন অভিধানের সাহায্যেই কেবল এগুলি বোঝা যেতে পারে।’

* * *

‘আমাদের—ইংরেজদের বরং ধারণা, ভারতকে আমাদের কাছ থেকে অনেক শিক্ষা করতে হবে। ভারত থেকে ইংরেজরা যে কিছু শিখতে পারে, এ-সম্বন্ধে সাধারণ লোক একরূপ অজ্ঞ বললেও হয়।’

‘তা সত্য বটে। কিন্তু পণ্ডিতেরা ভালভাবেই জানেন, ভারত থেকে কতদূর শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে, আর ঐ শিক্ষা কতদূরই বা প্রয়োজনীয়। আপনি দেখবেন—ম্যাক্সমূলার, মোনিয়ার উইলিয়ামস্, স্যার উইলিয়ম হাণ্টার বা জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভারতীয় সূক্ষ্মবিজ্ঞান (abstract science)-কে অবজ্ঞা করেন না।’

৫. স্বামীজীর সহিত মাদুরায় একঘণ্টা

['হিন্দু', মান্দ্রাজ; ফেব্রুআরী, ১৮৯৭]

প্রশ্ন॥ আমার যতদূর জানা আছে, 'জগৎ মিথ্যা'—এই মতবাদ এই কয়েক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকেঃ

(১) অনন্তের তুলনায় নশ্বর নামরূপের স্থায়িত্ব এত অল্প যে, তাহা বলিবার নয়। (২) দুইটি প্রলয়ের অন্তর্গত কাল অনন্তের তুলনায় ঐরূপ। (৩) যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান বা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রমাবস্থায় সত্য, আর ঐ জ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, সেইরপ বর্তমানে এই জগতেরও একটা আপাতপ্রতীয়মান সত্যতা আছে, উহারও সত্যতা-জ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু পরমার্থতঃ (চরমে বা পরিণামে) মিথ্যা। (৪) বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃঙ্গ যেমন মিথ্যা, জগৎও তেমনি একটা মিথ্যা ছায়ামাত্র।

এই কয়েকটি ভাবের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্তদর্শনে ' জগৎ মিথ্যা' এই মতটি কোন্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে?

উত্তর॥ অদ্বৈতবাদীদের ভিতর অনেক শ্রেণী আছে—প্রত্যেকেই কিন্তু ঐগুলির মধ্যে কোন-না-কোন একটি ভাবে অদ্বৈতবাদ বুঝিয়াছেন। শঙ্কর তৃতীয় ভাবানুযায়ী শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ—এই জগৎ আমাদের নিকট যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা সবই বর্তমান জ্ঞানের পক্ষে ব্যবহারিক ভাবে সত্য; কিন্তু যখনই মানবের জ্ঞান উচ্চ আকার ধারণ করে, তখনই উহা একেবারে অন্তর্হিত হয়; সম্মুখে একটা স্থাণু দেখিয়া আপনার ভূত বলিয়া ভ্রম হইতেছে। সেই সময়ের জন্য সেই ভূতের জ্ঞানটি সত্য; কারণ, যথার্থ ভূত হইলে উহা আপনার মনে যেরূপ কাজ করিত, যে-ফল উৎপন্ন করিত, ইহাতেও ঠিক সেই ফল হইতেছে। যখনই আপনি বুঝিবেন—উহা স্থাণুমাত্র, তখনই আপনার ভূত-জ্ঞান

চলিয়া যাইবে। স্থানু ও ভূত—উভয় জ্ঞান একত্র থাকিতে পারে না। একটি যখন বর্তমান, অপরটি তখন থাকে না।

প্র॥ শঙ্করের কতকগুলি গ্রন্থে চতুর্থ ভাবটিও কি গৃহীত হয় নাই?

উ॥ না। কোন কোন ব্যক্তি শঙ্করের 'জগৎ মিথ্যা'—এই উপদেশটির মর্ম ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিয়া উহাকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের গ্রন্থে চতুর্থ ভাবটি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাব দুটি, কয়েক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী গ্রন্থের বিশেষত্ব বটে, কিন্তু শঙ্কর ঐগুলি কখনও অনুমোদন করেন নাই।

প্র॥ এই আপাতপ্রতীয়মান সভ্যতার কারণ কি?

উ॥ স্থাণুতে ভূত-ভ্রান্তির কারণ কি? জগৎ প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই একরূপ রহিয়াছে, আপনার মনই ইহাতে নানা অবস্থা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছে।

প্র॥ 'বেদ অনাদি অনন্ত'—এ-কথার বাস্তবিক তাৎপর্য কি? উহা কি বৈদিক মন্ত্ররাজির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে? যদি বেদমন্ত্রে নিহিত সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই 'বেদ অনাদি অনন্ত' বলা হইয়া থাকে, তবে ন্যায় জ্যামিতি রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রও অনাদি অনন্ত; কারণ তাহাদের মধ্যেও তো সনাতন সত্য রহিয়াছে?

উ॥ এমন এক সময় ছিল, যখন বেদের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ অপরিণামী ও সনাতন, মানবের নিকট কেবল অভিব্যক্তি হইয়াছে মাত্র—এইভাবে বেদসমূহ অনাদি অনন্ত বিবেচিত হইত। পরবর্তী কালে বোধ হয় যেন অর্থজ্ঞানের সহিত বৈদিক মন্ত্রগুলিই প্রাধান্য লাভ করিল এবং ঐ মন্ত্রগুলিকেই ঈশ্বরপ্রসূত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। আরও পরবর্তী কালে মন্ত্রগুলির অর্থেই প্রকাশ পাইল যে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি কখনও ঈশ্বরপ্রসূত হইতে পারে না; কারণ ঐগুলি মানবজাতিকে—প্রাণিগণকে—যন্ত্রণাদান প্রভৃতি নানাবিধ পাপজনক কার্যের বিধান দিয়াছে, উহাদের মধ্যে অনেক 'আষাঢ়ে গল্প'ও দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ 'অনাদি অনন্ত'—এ-কথার যথার্থ

তাৎপর্য এই যে, উহা দ্বারা মানবজাতির নিকট যে বিধি বা সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিত্য ও অপরিণামী। ন্যায়, জ্যামিতি, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রও মানবজাতির নিকট নিত্য অপরিণামী নিয়ম বা সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, আর সেই অর্থে উহারাও অনাদি অনন্ত। কিন্তু এমন সত্য বা বিধিই নাই, যাহা বেদে নাই; আর আমি আপনাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি—উহাতে ব্যাখ্যাত হয় নাই, এমন কি সত্য আছে, দেখাইয়া দিন।

প্র॥ অদ্বৈতবাদীদের মুক্তির ধারণা কিরূপ? আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই—তাঁহাদের মতে কি ঐ অবস্থার জ্ঞান থাকে? অদ্বৈতবাদীদের মুক্তি ও বৌদ্ধনির্বাণে কোন প্রভেদ আছে কি?

উ॥ মুক্তিতে একপ্রকার জ্ঞান থাকে, উহাকে আমরা 'তুরীয় জ্ঞান' বা অতিচেতন অবস্থা বলিয়া থাকি। উহার সহিত আপনাদের বর্তমান জ্ঞানের প্রভেদ আছে। মুক্তি-অবস্থায় কোনরূপ জ্ঞান থাকে না, বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। আলোকের মত জ্ঞানেরও তিন অবস্থা—মৃদু জ্ঞান, মধ্যবিধ জ্ঞান ও চরম জ্ঞান। যখন আলোকের স্পন্দন অতি প্রবল হয়, তখন উহার ঔজ্জ্বল্য এত অধিক হয় যে, উহা চক্ষুকে ধাঁধিয়া দেয়, আর অতি ক্ষীণতম আলোকে যেমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, উহাতেও সেইরূপ কিছুই দেখা যায় না। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই। বৌদ্ধেরা যাহাই বলুন না কেন, নির্বাণেও ঐ-প্রকার জ্ঞান বিদ্যমান। আমাদের মুক্তির সংজ্ঞা অস্তিভাবাত্মক, বৌদ্ধ নির্বাণের সংজ্ঞা নাস্তিভাবদ্যোতক।

প্র॥ তুরীয় ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টির জন্য অবস্থাবিশেষ আশ্রয় করেন কেন?

উ॥ এই প্রশ্নটিই অযৌক্তিক, সম্পূর্ণ ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ব্রহ্ম 'অবাঙ্-মনসোগোচরম্,' অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বা মনের দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না। যাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত প্রদেশে অবস্থিত, তাহাকে মানব-মনের দ্বারা ধারণা করিতে পারা যায় না; আর দেশ-কাল-নিমিত্তের অন্তর্গত রাজ্যেই যুক্তি ও অনুসন্ধানের অধিকার। তাই যদি হয়, তবে যে-বিষয়ে মানব-বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, সে-সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা বৃথা চেষ্টা মাত্র।

প্র॥ দেখা যায়—অনেকে বলেন, পুরাণগ্রন্থগুলির আপাত-প্রতীয়মান অর্থের পশ্চাতে গুহ্য অর্থ আছে। তাঁহারা বলেন, ঐ গুহ্য ভাবগুলি পুরাণে রূপকচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলেন যে, পুরাণের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র নাই—উচ্চতম আদর্শসমূহ বুঝাইবার জন্য পুরাণকার কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ বা মহাভারতের কথা ধরুন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাস্তবিক কি ঐগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা কিছু আছে, অথবা উহারা কেবল দার্শনিক সত্যসমূহের রূপকভাবে বর্ণনা, অথবা মানবজাতির চরিত্র নিয়মিত করিবার জন্য উচ্চতম আদর্শসমূহেরই দৃষ্টান্ত, কিম্বা উহারা মিল্টন হোমর প্রভৃতির কাব্যের ন্যায় উচ্চভাবাত্মক কাব্যমাত্র?

উ॥ কিছু-না-কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। পুরাণের উদ্দেশ্য—নানাভাবে পরম সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। আর যদিও সেগুলিতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি উহারা যে উচ্চতম সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামায়ণের কথা ধরুন—অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে, রামের ন্যায় কেহ কখনও যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে-ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; সুতরাং ইঁহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়াও রামায়ণ-মহাভারতকে মানবজাতির নিকট উপদিষ্ট মহান্ ভাবসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। আমাদের দর্শন উহার সত্যতার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। দেখুন, কৃষ্ণ জগতের সমক্ষে নূতন বা মৌলিক কিছুই শিক্ষা দেন নাই, আর রামায়ণকারও এমন কথা বলেন না যে, বেদাদি শাস্ত্রে যাহা আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, এমন কিছু তত্ত্ব তিনি শিখাইতে চান। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্ট ব্যতীত, মুসলমানধর্ম মহম্মদ এবং বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ ব্যতীত টিকিতে পারে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না। কোন পুরাণে বর্ণিত দার্শনিক সত্য কতদূর প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন, অথবা তাঁহারা

কাল্পনিক চরিত্রমাত্র, এ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির শিক্ষা—আর যে-সকল ঋষি ঐ পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতকগুলি ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া ইচ্ছামত যত কিছু ভাল বা মন্দ গুণ উহাদের উপর আরোপ করিতেন—এইরূপে তাঁহারা মানবজাতির পরিচালনার জন্য ধর্মের বিধান দিয়াছেন। রামায়ণে বর্ণিত দশমুখ রাবণের অস্তিত্ব—একটা দশমাথাযুক্ত রাক্ষস অবশ্যই ছিল—মানিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? দশানন নামে কোন ব্যক্তি বাস্তবিকই থাকুন, বা উহা কবিকল্পনাই হউক, ঐ চরিত্রসহায়ে এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। আপনি এখন কৃষ্ণকে আরও মনোহরভাবে বর্ণনা করিতে পারেন, আপনার বর্ণনা আদর্শের উচ্চতার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু পুরাণে নিবদ্ধ মহোচ্চ দার্শনিক সত্যসমূহ চিরকালই একরূপ।

প্র॥ যদি কোন ব্যক্তি সিদ্ধ (adept) হন, তবে কি তাঁহার পক্ষে তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করা সম্ভব? পূর্বজন্মের স্থূল মস্তিষ্ক—যাহার মধ্যে তাঁহার পূর্বানুভূতির সংস্কারসমূহ সঞ্চিত ছিল—এখন তাহা আর নাই, এ-জন্মে তিনি একটি মস্তিষ্ক পাইয়াছেন। তাহাই যদি হইল, তবে বর্তমান মস্তিষ্কের পক্ষে অধুনা অবর্তমান অপর যন্ত্রের দ্বারা গৃহীত সংস্কারসমূহকে গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?

স্বামীজী॥ আপনি সিদ্ধ (adept) বলিতে কি লক্ষ্য করিতেছেন?

সংবাদদাতা॥ যিনি নিজের ‘গুহ্য’ শক্তিসমূহের ‘বিকাশ’ করিয়াছেন।

স্বামীজী॥ ‘গুহ্য’ শক্তি কিভাবে ‘বিকাশ’ প্রাপ্ত হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার ভাব আমি বুঝিতেছি, কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা—যে-সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, সেগুলির অর্থে যেন কোনরূপ অনির্দিষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবের ছায়ামাত্র না থাকে। যেখানে যে-শব্দটি যথার্থ উপযোগী, সেখানে যেন ঠিক সেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আপনি বলিতে পারেন, ‘গুহ্য’ বা ‘অব্যক্ত’ শক্তি ‘ব্যক্ত’ বা ‘নিরাবরণ’ হয়। যাঁহাদের অব্যক্ত

শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বজন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিতে পারেন। কারণ মৃত্যুর পর যে সূক্ষ্ম শরীর থাকে, তাহাই তাঁহাদের বর্তমান মস্তিষ্কের বীজস্বরূপ।

প্র॥ অহিন্দুকে হিন্দুধর্মাবলম্বী করা কি হিন্দুধর্মের মূলভাবের অবিরোধী, আর চণ্ডাল যদি দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে, ব্রাহ্মণ কি তাহা শুনিতে পারেন?

উ॥ অহিন্দুকে হিন্দু করা হিন্দুধর্ম আপত্তিকর জ্ঞান করে না। যে-কোন ব্যক্তি—তিনি শূদ্রই হউন আর চণ্ডালই হউন—ব্রাহ্মণের নিকট পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অতি নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও—তিনি যে-কোন জাতি হউন বা যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউন—সত্য শিক্ষা করা যাইতে পারে।

স্বামীজী তাঁহার এই মতের পক্ষে খুব প্রামাণ্য সংস্কৃত শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিলেন। এই স্থানেই কথাবার্তা বন্ধ হইল, কারণ তাঁহার মন্দিরদর্শনে যাইবার সময় হইয়াছিল। সুতরাং তিনি উপস্থিত ভদ্রলোকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মন্দিরদর্শনে যাত্রা করিলেন।

৬. ভারত ও অন্যান্য দেশের নানা সমস্যা

[‘হিন্দু’, মান্দ্রাজ; ফেব্রুআরী, ১৮৯৭]

আমাদের জনৈক প্রতিনিধি চিঙলপুট ষ্টেশনে স্বামীজীর সহিত ট্রেনে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত মান্দ্রাজ পর্যন্ত আসেন। গাড়ীতে উভয়ের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিলঃ

‘স্বামীজী, আপনি আমেরিকায় কেন গেছলেন?’

‘বড় শক্ত কথা। সংক্ষেপে এর উত্তর দেওয়া কঠিন। এখন আমি এর আংশিক উত্তর মাত্র দিতে পারি। ভারতের সব জায়গায় আমি ঘুরছিলুম–দেখলুম, ভারতে যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে; তখন অন্য অন্য দেশে যাবার ইচ্ছা হল। আমি জাপানের দিক্ দিয়ে আমেরিকায় গেছলুম।’

‘ আপনি জাপানে কি দেখলেন? জাপান উন্নতির যে-পথে চলেছে, ভারতের কি তা অনুসরণ করবার কোন সম্ভাবনা আছে–মনে করেন?’

‘কোন সম্ভাবনা নেই, যতদিন না ভারতের ত্রিশ কোটি লোক মিলে একটা জাতি হয়ে দাঁড়ায়। জাপানীর মত এমন স্বদেশহিতৈষী ও শিল্পপটু জাত আর দেখা যায় না; আর তাদের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইওরোপ ও অন্য স্থানে একদিকে যেমন শিল্পের বাহার, অপরদিকে আবার তেমনি অপরিষ্কার, কিন্তু জাপানীদের যেমন শিল্পের সৌন্দর্য, তেমনি আবার তারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার ইচ্ছে–আমাদের যুবকেরা জীবনে অন্ততঃ একবার জাপানে বেড়িয়ে আসে। যাওয়াও কিছু শক্ত নয়। জাপানীরা হিন্দুদের সবই খুব ভাল বলে মনে করে, আর ভারতকে তীর্থস্বরূপ বলে বিশ্বাস করে। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম

আর জাপানের বৌদ্ধধর্ম ঢের তফাত। জাপানের বৌদ্ধধর্ম বেদান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক্যবাদে দূষিত, জাপানের বৌদ্ধধর্ম আস্তিক।'

'জাপান হঠাৎ এ-রকম বড় হল কি করে? এর রহস্যটা কি?'

'জাপানীদের আত্মপ্রত্যয় আর তাদের স্বদেশের উপর ভালবাসা। যখন ভারতে এমন লোক জন্মাবে, যারা দেশের জন্য সব ছাড়তে প্রস্তুত, আর যাদের মন মুখ এক, তখন ভারতও সব বিষয়ে বড় হবে। মানুষ নিয়েই তো দেশের গৌরব। শুধু দেশে আছে কি? জাপানীরা সামাজিক ও রাজনীতিক বিষয়ে যেমন সাচ্চা, তোমাদেরও যখন তাই হবে, তোমরাও তখন জাপানীদের মত বড় হবে। জাপানীরা তাদের দেশের জন্যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাইতেই তারা বড় হয়েছে। তোমরা যে কাম-কাঞ্চনের জন্য সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত!'

'আপনার কি ইচ্ছে যে ভারত জাপানের মত হোক?'

'তা কখনই নয়। ভারত ভারতই থাকবে। ভারত কেমন করে জাপান বা অন্য জাতের মত হবে? যেমন সঙ্গীতে একটা করে প্রধান সুর থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই এক-একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্য অন্য ভাবগুলি তার অনুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজ-সংস্কার এবং অন্য সবই গৌণ। লোকে বলে হৃদয় উন্মুক্ত হলে চিন্তার প্রবাহ আসে। ভারতের হৃদয়ও এক সময়ে উন্মুক্ত হবে, তখন ধর্মতরঙ্গ খেলতে থাকবে! ভারত ভারতই। আমরা জাপানীদের মত নই, আমরা হিন্দু। ভারতের হাওয়াতেই কেমন শান্তি এনে দেয়! আমি এখানে সর্বদা কাজ করছি, কিন্তু এরই মধ্যে আমি বিশ্রাম লাভ করছি। ভারতে ধর্মকার্য করলে শান্তি পাওয়া যায়, এখানে সাংসারিক কার্য করতে গেলে শেষে মৃত্যু হয়—বহুমূত্র হয়ে।'

'যাক জাপানের কথা। আচ্ছা, স্বামীজী, আপনি আমেরিকায় গিয়ে প্রথমে কি দেখলেন?' গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ভালই দেখেছিলুম। কেবল মিশনরী আর 'চার্চের মেয়েরা'

(church-women) ছাড়া আমেরিকানরা সকলেই বড় অতিথিবৎসল সৎস্বভাব ও সহৃদয় ব্যক্তি।'

'চার্চের মেয়েরা কি, স্বামীজী?'

'মার্কিন মেয়ে যখন বে করবার জন্য উঠে পড়ে লাগে, তখন সব রকম সমুদ্রতীরবর্তী স্নানের জায়গায় ঘুরতে থাকে, আর একটা পুরুষ পাকড়াবার জন্য যত রকম কৌশল করবার চেষ্টা করে। সব চেষ্টা করে যখন বিফল হয়, তখন সে চার্চে যোগ দেয়, তখন তাকে ওখানে 'ওল্ড মেড' বলে। তাদের মধ্যে অনেকে চার্চের বেজায় গোঁড়া হয়ে দাঁড়ায়। ... এদের বাদ দিলে, আমেরিকানরা বড় ভাল লোক। তারা আমায় ভালবাসত, আমিও তাদের খুব ভালবাসি। আমি যেন তাদেরই একজন, এই-রকম বোধ করতাম।'

'চিকাগো ধর্ম-মহাসভা হয়ে কি ফল দাঁড়াল, আপনার ধারণা?'

'আমার ধারণা, চিকাগো ধর্ম-মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল—জগতের সামনে অ-খ্রীষ্টান ধর্মগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করা। কিন্তু দাঁড়াল অ-খ্রীষ্টান ধর্মের প্রাধান্য। সুতরাং খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিতে ঐ মহাসভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। দেখ না কেন, এখন প্যারিসে আর একটা মহাসভা হবার কথা হচ্ছে, কিন্তু রোমান ক্যাথলিকরা, যাঁরা চিকাগো মহাসভার উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁরাই এখন যাতে প্যারিসে ধর্ম-মহাসভা না হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। কিন্তু চিকাগো সভা দ্বারা ভারতীয় চিন্তার বিশেষরূপ বিস্তারের সুবিধা হয়েছে! ওতে বেদান্তের চিন্তাধারা বিস্তার হবার সুবিধে হয়েছে—এখন সমগ্র জগৎ বেদান্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। অবশ্য আমেরিকানরা চিকাগো সভার এই পরিণামে বিশেষ সুখী—কেবল গোঁড়া পুরোহিত আর 'চার্চের মেয়েরা' ছাড়া।'

'ইংলণ্ডে আপনার প্রচারকার্যের কিরূপ আশা দেখছেন, স্বামীজী?'

'খুব আশা আছে। দশ বৎসরও যেতে হবে না—অধিকাংশ ইংরেজই বেদান্তী হবে। আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডে বেশী আশা। আমেরিকানরা তো দেখছ—সব বিষয়েই একটা

হুজুক করে তোলে। ইংরেজরা হুজুগে নয়। বেদান্ত না বুঝলে খ্রীষ্টানেরা তাদের নিউ টেষ্টামেণ্টও বুঝতে পারে না। বেদান্ত সব ধর্মেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাস্বরূপ। বেদান্তকে ছাড়লে সব ধর্মই কুসংস্কার। বেদান্তকে ধরলে সবই ধর্ম হয়ে দাঁড়াবে।'

'আপনি ইংরেজ-চরিত্রে বিশেষ কি গুণ দেখলেন?'

' ইংরেজরা কোন বিষয়ে বিশ্বাস করলেই তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে যায়। ওদের কাজের শক্তি অসাধারণ। ইংরেজ পুরুষ ও মহিলার চেয়ে উন্নততর নরনারী সারা পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই তাদের উপর আমার বেশী বিশ্বাস। অবশ্য প্রথমে তাদের মাথায় কিছু ঢোকান বড় কঠিন; অনেক চেষ্টাচরিত্র করে উঠে পড়ে লেগে থাকলে তবে তাদের মাথায় একটা ভাব ঢোকে, কিন্তু একবার দিতে পারলে আর সহজে সেটি বেরোয় না। ইংলণ্ডে কোন মিশনরী বা অন্য কোন লোক আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেনি—একজনও আমার কোন রকম নিন্দে করবার চেষ্টা করেনি। আমি দেখে আশ্চর্য হলুম, অধিকাংশ বন্ধুই 'চার্চ অব্ ইংলণ্ডে'র অন্তর্ভুক্ত। আমি জেনেছি যে-সব মিশনরী এ দেশে আসে, তারা ইংলণ্ডের খুব নিম্নশ্রেণীভুক্ত। কোন ভদ্র ইংরেজ তাদের সঙ্গে মেশে না। এখানকার মত ইংলণ্ডেও জাতের খুব কড়াকড়ি। আর 'চার্চে'র সদস্য ইংরেজরা ভদ্রশ্রেণীভুক্ত। আপনার সঙ্গে তাঁদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আপনার সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব হবার কিছু ব্যাঘাত হবে না। এই জন্মে আমি আমার স্বদেশবাসীকে এই একটি পরামর্শ দিতে চাই যে, মিশনরীরা কি, তা তো এখন জেনেছি; এখন এই কর্তব্য যে, এই গালাগালবাজ মিশনরীদের মোটেই আমল না দেওয়া। আমরাই তো ওদের আস্কারা দিয়েছি। এখন ওদের মোটে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনাই কর্তব্য।'

'স্বামীজী, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমাজসংস্কার আন্দোলন কি রকম, অনুগ্রহ করে এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?'

'সব সমাজ-সংস্কারকেরা, অন্ততঃ তাঁদের নেতারা, এখন তাঁদের সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্টা করছে—আর সেই ভিত্তি কেবল

বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক নেতা, যাঁরা আমার বক্তৃতা শুনতে আসতেন, আমায় বলেছেন, নূতন ভাবে সমাজ গঠন করতে হলে বেদান্তকে ভিত্তিস্বরূপ নেওয়া দরকার।'

'ভারতের জনসাধারণ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?'

'আমরা ভয়ানক গরীব। আমাদের জনসাধারণ লৌকিক বিদ্যায় বড়ই অজ্ঞ, কিন্তু তারা বড় ভাল। কারণ এখানে দারিদ্র্য একটা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। এরা দুর্দান্তও নয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অনেক সময় আমার পোষাকের দরুন জনসাধারণ খেপে অনেকবার আমাকে মারবার যোগাড়ই করেছিল। কিন্তু ভারতে কারও অসাধারণ পোষাকের দরুন জনসাধারণ খেপে গিয়ে মারতে উঠেছে, এ-রকম কথা তো কখনও শুনিনি। অন্যান্য সব বিষয়েও আমাদের জনসাধারণ ইওরোপের জনসাধারণের চেয়ে ঢের সভ্য।'

'ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতির জন্য কি করা ভাল বলেন?'

'তাঁদের লৌকিক বিদ্যা শেখাতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে-প্রণালী দেখিয়ে গেছেন, তারই অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ বড় বড় আদর্শগুলি ধীরে ধীরে সাধারণের ভেতর সঞ্চারিত করতে হবে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে নাও, ধীরে ধীরে তাদের সমান করে নাও। লৌকিক বিদ্যাও ধর্মের ভিতর দিয়ে শেখাতে হবে।'

'কিন্তু স্বামীজী, আপনি কি মনে করেন, এ কাজ সহজে হতে পারে?'

'অবশ্য এটা ধীরে ধীরে কাজে পরিণত করতে হবে। কিন্তু যদি আমি অনেকগুলি স্বার্থত্যাগী যুবক পাই, যারা আমার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, তা হলে কালই এটা হতে পারে। কেবল এই কাজে যে পরিমাণে উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ করা হবে, তারই উপর নির্ভর করছে—এ কাজ তাড়াতাড়ি হবে বা দেরীতে হবে।'

‘কিন্তু যদি বর্তমান হীনাবস্থা তাদের অতীত কর্মের ফল হইয়া থাকে, তবে আপনার বিবেচনায় কিভাবে সহজে এটি ঘুচবে আর আপনি কেমন করেই বা তাদের সাহায্য করবার ইচ্ছা করেন?’

স্বামীজী মুহূর্তমাত্র চিন্তার অবসর না লইয়াই উত্তর দিলেন, ‘কর্মবাদই অনন্তকাল মানবের স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। কর্মের দ্বারা নিজেদের হীন অবস্থায় এনেছি—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে কর্মের দ্বারা আমাদের অবস্থার উন্নতিসাধনও নিশ্চয়ই করতে পারি। আরও কথা এই, জনসাধারণ কেবল যে নিজেদের কর্মের দ্বারাই এই হীনাবস্থা এনেছে, তা নয়। সুতরাং তাদের উন্নতি করবার আরও সুবিধা দিতে হবে। আমি সব জাতকে একাকার করতে বলি না। জাতিবিভাগ খুব ভাল। এই জাতিবিভাগ-প্রণালীই আমরা অনুসরণ করতে চাই। জাতিবিভাগ যথার্থ কি, তা লাখে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে জাত নেই। ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়ে ‘জাতির অতীত’ অবস্থায় গিয়ে থাকি। জাতিবিভাগ ঐ মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতিবিভাগ-প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়, তবে দেখবে—এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়েছেও। আরও অনেক হবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হবে। এই আমাদের কার্যপ্রণালী। কাকেও নামাতে হবে না—সকলকে ওঠাতে হবে। আর এইটি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের করতে হবে, কারণ প্রত্যেক অভিজাত সম্প্রদায়েরই কর্তব্য নিজেদের মূলোচ্ছেদ করা। আর যত শীগগীর তাঁরা এটি করেন, ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। এ বিষয়ে দেরী করা উচিত নয়, বিন্দুমাত্র কালপেক্ষ করা উচিত নয়। ইওরোপ-আমেরিকার জাতিবিভাগের চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ অনেক ভাল। অবশ্য আমি এ-কথা বলি না যে, এর সবটাই ভাল। যদি জাতিবিভাগ না থাকত তবে তোমরা থাকতে কোথায়? জাতিবিভাগ না থাকলে তোমাদের বিদ্যা ও আর আর জিনিষ কোথায় থাকত? জাতিবিভাগ না থাকলে ইওরোপীয়দের পড়বার জন্যে এ-সব শাস্ত্রাদি কোথায় থাকত? মুসলমানরা তো সবই নষ্ট করে ফেলত। ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে দেখেছ? এ সমাজ সর্বদাই গতিশীল। কখনও কখনও, যেমন বিজাতীয় আক্রমণের সময়, এই গতি

মৃদু হয়েছিল, অন্য সময়ে আবার দ্রুত। আমি আমার স্বদেশীদের এই কথাই বলি। আমি তাদের গাল দিই না। আমি অতীতের দিকে দেখি। আর দেখতে পাই, দেশ-কাল-অবস্থা বিবেচনা করলে কোন জাতই এর চেয়ে মহৎ কর্ম করতে পারত না। আমি বলি, তোমরা বেশ করেছ, এখন আরও ভাল করবার চেষ্টা কর।'

'জাতিবিভাগের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ-বিষয়ে আপনার কি মত, স্বামীজী?'

'জাতিবিভাগ-প্রণালীও ক্রমাগত বদলাচ্ছে, ক্রিয়াকাণ্ডও ক্রমাগত বদলাচ্ছে! কেবল মূল তত্ত্ব বদলাচ্ছে না। আমাদের ধর্ম কি, জানতে গেলে বেদ পড়তে হবে। বেদ ছাড়া আর সব শাস্ত্রই যুগভেদে বদলে যাবে। বেদের শাসন নিত্য। অন্যান্য শাস্ত্রের শাসন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ। যেমন কোন 'স্মৃতি' এক যুগের জন্য, আর একটি 'স্মৃতি' আর এক যুগের জন্য। বড় বড় মহাপুরুষ অবতারেরা সর্বদাই আসছেন, আর কিভাবে কাজ করতে হবে, দেখিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকজন মহাপুরুষ নিম্নজাতির উন্নতির চেষ্টা করে গেছেন। কেউ কেউ– যেমন মধ্বাচার্য–নারীদের বেদ পড়বার অধিকার দিয়েছেন। জাতিবিভাগ কখনও যেতে পারে না, তবে মাঝে মাঝে একে নূতন ছাঁচে ঢালতে হবে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ভেতর এমন প্রাণশক্তি আছে, যাতে দু-লক্ষ নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হতে পারে। জাতিবিভাগ উঠিয়ে দেবার ইচ্ছা করাও পাগলামি মাত্র। পুরাতনেরই নব বিবর্তন বা বিকাশ–এই হল নূতন কার্যপ্রণালী।'

'হিন্দুদের কি সমাজ-সংস্কারের দরকার নেই?'

' খুব আছে। প্রাচীনকালে মহাপুরুষেরা উন্নতির নূতন নূতন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতেন, আর রাজারা আইন করে সেগুলি চালিয়ে দিতেন। প্রাচীনকালে ভারতে এই-রকম করেই সমাজের উন্নতি হত। বর্তমান কালে এইভাবে সামাজিক উন্নতি করতে গেলে এমন একটি শক্তি চাই, যার কথা লোকে নেবে। এখন হিন্দু রাজা নেই, এখন লোকদের নিজেদেরই সমাজের সংস্কার, উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং যতদিন না লোকে শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অভাব বোঝে, আর নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে প্রস্তুত ও

সমর্থ হয়, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কোন সংস্কারের সময় সংস্কারের পক্ষে লোক খুব অল্পই পাওয়া যায়, এর চেয়ে আর দুঃখের বিষয় কিছু হতে পারে না। এইজন্য কেবল কতকগুলি কাল্পনিক সংস্কারে—যা কখনও কার্যে পরিণত হবে না, তাতে বৃথা শক্তিক্ষয় না করে আমাদের উচিত একেবারে মূল থেকে প্রতিকারের চেষ্টা করা—এমন একদল লোক তৈরী করা, যারা নিজেদের আইন নিজেরাই করবে। অর্থাৎ এর জন্যে লোকদের শিক্ষা দিতে হবে—তাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে নেবে। তা না হলে এ-সব সংস্কার আকাশকুসুমই থেকে যায়। নূতন প্রণালী হল নিজেদের দ্বারা নিজেদের উন্নতি-সাধন। এটি কাজে পরিণত করতে সময় লাগবে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে; কারণ প্রাচীনকালে এখানে বরাবরই রাজার অব্যাহত শাসন ছিল।'

'আপনি কি মনে করেন, হিন্দুসমাজ ইওরোপীয় সমাজের রীতিনীতি গ্রহণ করে কৃতকার্য হতে পারে?

,

'না সম্পূর্ণরূপে নয়। আমি বলি যে, গ্রীক মন—যা ইওরোপীয় জাতির বহির্মুখ শক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে—তার সঙ্গে হিন্দু মন মিলিত হলে ভারতের পক্ষে আদর্শ সমাজ হবে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, মিছামিছি শক্তিক্ষয়, আর দিনরাত কতকগুলো বাজে কাল্পনিক বিষয়ে বাক্যব্যয় না করে ইংরেজদের কাছ থেকে—আজ্ঞামাত্র নেতার আদেশ-পালন, ঈর্ষাহীনতা, অদম্য অধ্যবসায় ও নিজেতে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখা আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার। কাকেও নেতা বলে স্বীকার করলে একজন ইংরেজ তাকে সব অবস্থায় মেনে চলবে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞাধীন হবে। ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম তালিম করবার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা। আমাদের ঈর্ষার অন্ত নেই; হিন্দুর পদমর্যাদা যত বাড়ে, ঈর্ষাও তত বাড়ে। যতদিন না এই ঈর্ষা দ্বেষ দূর হয় এবং নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শেখে, ততদিন একটা সমাজ-সংহতি হতেই পারে না, ততদিন আমরা এই-রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকব, কিছুই করতে পারব না। ইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে—বহিঃপ্রকৃতি জয়, আর

ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে শিখতে হবে–অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তা হলে আর হিন্দু বা ইওরোপীয় বলে কিছু থাকবে না; উভয়-প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের একদিক, ওরা আর একদিক বিকাশ করেছে। এই দুইটির মিলনই দরকার। মুক্তি, যা আমাদের ধর্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থ–দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।'

'স্বামীজী, ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ?'

'ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে ধর্মের 'কিণ্ডারগার্টেন' বিদ্যালয়। জগতের এখন যে অবস্থা, তাতে ওটি এখনও পুরোপুরি আবশ্যক। তবে লোককে নূতন নূতন অনুষ্ঠান দিতে হবে। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির উচিত–এই কাজের ভার লওয়া। পুরাতন ক্রিয়াকাণ্ডগুলি উঠিয়ে দিতে হবে, নূতন নূতন আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করতে হবে।'

'তবে আপনি ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে উঠিয়ে দিতে বলেন না, দেখছি।'

'না, আমার মূলমন্ত্র গঠন, বিনাশ নয়। বর্তমান ক্রিয়াকাণ্ড থেকে নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড করতে হবে। সব বিষয়েরই অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে–এই আমার বিশ্বাস। একটা পরমাণুর পেছনে সমগ্র জগতের শক্তি রয়েছে। হিন্দুজাতির ইতিহাসে বরাবর–কখনই বিনাশের চেষ্টা হয়নি, গঠনেরই চেষ্টা হয়েছে। এক সম্প্রদায় বিনাশের চেষ্টা করেন, তার ফলে ভারত থেকে বহির্ভূত হলেন–তাঁদের নাম বৌদ্ধ। আমাদের শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক সংস্কারক হয়েছেন। তাঁরা সকলেই খুব বড় দরের সংস্কারক ছিলেন–তাঁরা সর্বদা গঠনই করেছিলেন, তাঁরা যে দেশ-কাল অনুসারে সমাজ গঠন করেছিলেন, সেই হল আমাদের কার্যপ্রণালীর বিশেষত্ব। আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা ইওরোপীয় ধ্বংসমূলক সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন–এতে কারও কোন উপকার হয়নি, হবেও না। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক গঠনকারী ছিলেন–রাজা রামমোহন রায়। হিন্দুজাতি বরাবরই বেদান্তের আদর্শ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করে চলেছে। সৌভাগ্যই হউক, আর দুর্ভাগ্যই হউক, সব অবস্থায় বেদান্তের এই আদর্শকে কার্যে পরিণত করবার

প্রাণপণ চেষ্টাই—ভারতীয় জীবনের সমগ্র ইতিহাস। যখনই এমন কোন সংস্কারক সম্প্রদায় বা ধর্ম উঠেছে, যারা বেদান্তের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ একেবারে মুছে গেছে।'

'আপনার এখানকার কার্যপ্রণালী কিরূপ?'

'আমি আমার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করবার জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চাই—একটি মান্দ্রাজে, আর একটি কলিকাতায়। আর আমার সঙ্কল্প সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হয় যে, বেদান্তের আদর্শ প্রত্যেকের জীবনে পরিণত করবার চেষ্টা—তা তিনি সাধুই হন, অসাধুই হন, জ্ঞানীই হন বা অজ্ঞানই হন, ব্রাহ্মণই হন আর চণ্ডালই হন।'

এইবার আমাদের প্রতিনিধি ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তার কোন উত্তর পাবার আগেই ট্রেন মান্দ্রাজের এগমোর ষ্টেশনের প্লাটফর্মে লাগল। এইটুকু মাত্র স্বামীজীর মুখ থেকে শোনা গেল, ভারত ও ইংলণ্ডের সমস্যাগুলিকে রাজনীতির সঙ্গে জড়ানর তিনি ঘোর বিরোধী।

৭. পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রচার

['মান্দ্রাজ টাইমস্', ফেব্রুআরী, ১৮৯৭]

গত শনিবার আমাদের পত্রের জনৈক ভারতীয় প্রতিনিধি পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার ধর্মপ্রচারের সফলতার বিবরণ জানিবার জন্য স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য সাঙ্কেতিক-লেখনবিৎ মিঃ গুডউইন মহাপুরুষের সহিত আমাদের প্রতিনিধির পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি তখন একখানি সোফায় বসিয়া সাধারণ লোকের মত জলযোগ করিতেছিলেন। স্বামীজী আমাদের প্রতিনিধিকে অতি ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করিয়া পার্শ্ববর্তী একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। স্বামীজী গৈরিকবসন-পরিহিত, তাঁহার আকৃতি ধীর স্থির শান্ত মহিমাব্যঞ্জক। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন যে-কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে প্রস্তুত। আমাদের প্রতিনিধি সাঙ্কেতিক-লিপি স্বারা স্বামীজীর কথাগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, আপনার বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি কি?'

স্বামীজী বলিলেন (তাঁহার উচ্চারণে একটু বাঙালী ধাঁচ পাওয়া যায়)—কলিকাতায় বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকাল হইতে আমার প্রকৃতি ধর্মপ্রবণ ছিল। তখনই সকল জিনিষ পরীক্ষা করিয়া লওয়া আমার স্বভাব ছিল—শুধু কথায় আমার তৃপ্তি হইত না। কিছুকাল পরেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া তাঁহার নিকটেই আমি ধর্ম শিক্ষা করি। তাঁহার দেহত্যাগের পর আমি ভারতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র মঠ স্থাপন করিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে

আমি মান্দ্রাজ আসি, এবং মহীশূরের স্বর্গীয় রাজা এবং রামনাদের রাজার নিকট সাহায্য লাভ করি।

‘ আপনি পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে গেলেন কেন?’

‘আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইয়াছিল। আমার মতে আমাদের জাতীয় অবনতির মূল কারণ–অপরাপর জাতির সহিত না মেশা। উহাই অবনতির একমাত্র কারণ। পাশ্চাত্যের সহিত আমরা কখনও পরস্পরের ভাবের তুলনামূলক আলোচনা করিবার সুযোগ পাই নাই। আমরা কূপমণ্ডুক হইয়া গিয়াছিলাম।’

‘আপনি পাশ্চাত্য দেশে বোধ হয় অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন?’

‘ আমি ইওরোপের অনেক স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছি–জার্মানী এবং ফ্রান্সেও গিয়াছি, তবে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেই ছিল আমার প্রধান কার্যক্ষেত্র। প্রথমটা আমি মুশকিলে পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণ, ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা সে-সব দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। আমার কিন্তু চিরকাল ধারণা, ভারতবাসীই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক জাতি। সেজন্য হিন্দুর সহিত অন্য কোন জাতিরই ঐ বিষয়ে তুলনা করাটা সম্পূর্ণ ভুল। সাধারণের নিকট হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য প্রথম প্রথম অনেকে আমার ভয়ানক নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা গল্পও রচনা করিয়াছিল। তাহারা বলিত, আমি জুয়াচোর, আমার এক-আধটি নয়–অনেকগুলি স্ত্রী ও একপাল ছেলে আছে। কিন্তু ঐ-সকল ধর্মপ্রচারক সম্বন্ধে যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, ততই তাহারা ধর্মের নামে যে কতদূর অধর্ম করিতে পারে, সে- বিষয়ে আমার চোখ খুলিয়া গেল। ইংলণ্ডে ঐরূপ মিশনরী-উৎপাত কিছুমাত্র ছিল না। উহাদের কেহই সেখানে আমার সঙ্গে লড়াই করিতে আসে নাই। আমেরিকায় কেহ কেহ আমার নামে গোপনে নিন্দা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু লোকে তাহাদের কথা শুনিতে চাহে নাই; কারণ আমি তখন লোকের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছি। যখন পুনরায় ইংলণ্ডে আসিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, জনৈক মিশনরী

সেখানেও আমার বিরুদ্ধে লাগিবে, কিন্তু 'ট্রুথ' পত্রিকা তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। ইংলণ্ডের সমাজবন্ধন ভারতের জাতিবিভাগ অপেক্ষাও কঠোরতর। ইংলিশ চার্চের সদস্যেরা সকলেই ভদ্রবংশজাত—মিশনরীদের অধিকাংশই কিন্তু তাহা নহে। চার্চের সদস্যেরা আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, প্রায় ত্রিশ জন ইংলিশ চার্চের প্রচারক ধর্মবিষয়ক নানা বিষয়ে আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু দেখিয়াছি, ইংলণ্ডের প্রচারক বা পুরোহিতেরা ঐ-সকল বিষয়ে আমার সহিত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কখনও গোপনে আমার নিন্দাবাদ করেন নাই। ইহাতে আমার আনন্দ ও বিস্ময় উভয়ই হইয়াছিল। ইহাই জাতিবিভাগ ও বংশপরম্পরাগত শিক্ষার গুণ।'

'আপনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচারে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন?'

'আমেরিকার অনেক লোক—ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী লোক—আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে। নিম্নজাতীয় মিশনরীগণের নিন্দা সেখানে আমার কাজের সহায়তাই করিয়াছিল। আমেরিকা পৌঁছিবার কালে আমার কাছে টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না। ভারতের লোকে আমার কেবল যাইবার ভাড়াটা মাত্র দিয়াছিল। অতি অল্প দিনে তাহা খরচ হইয়া যায়, সেজন্য এখানে যেমন সেখানেও তেমনি সাধারণের উপর নির্ভর করিয়াই আমাকে বাস করিতে হইয়াছিল। মার্কিনেরা বড়ই অতিথিবৎসল। আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ লোক খ্রীষ্টান। অবশিষ্টের কোন ধর্ম নাই, অর্থাৎ তাহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যেই বিশিষ্ট ধার্মিক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বোধ হয়, ইংলণ্ডে আমার যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহা পাকা হইয়াছে। যদি আমি কাল মরিয়া যাই এবং কাজ চালাইবার জন্য সেখানে কোন সন্ন্যাসী পাঠাইতে না পারি, তাহা হইলেও ইংলণ্ডের কাজ চলিবে। ইংরেজ খুব ভাল লোক। বাল্যকাল হইতেই তাহাকে সমুদয় ভাব চাপিয়া রাখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজের মস্তিষ্ক একটু মোটা, ফরাসী বা মার্কিনের মত চট করিয়া সে কোন জিনিষ ধরিতে পারে না, কিন্তু ভারী দৃঢ়কর্মী। মার্কিন জাতির বয়স এখনও এমন হয় নাই যে, তাহারা ত্যাগের মাহাত্ম বুঝিবে। ইংলণ্ড শত শত যুগ ধরিয়া বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য ভোগ করিয়াছে—সেজন্য সেখানে অনেকেই এখন ত্যাগের জন্য

প্রস্তুত। প্রথমবার ইংলণ্ডে গিয়া যখন আমি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করি, তখন আমার ক্লাসে বিশ-ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিত। সেখান হইতে আমার আমেরিকা চলিয়া যাওয়ার পরেও ক্লাস চলিতে থাকে। পরে পুনরায় যখন আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলাম, তখন আমি ইচ্ছা করিলেই এক সহস্র শ্রোতা পাইতাম। আমেরিকায় উহা অপেক্ষাও অনেক অধিক শ্রোতা পাইতাম, কারণ আমি আমেরিকায় তিন বৎসর ও ইংলণ্ডে মাত্র এক বৎসর কাটাইয়াছিলাম। ইংলণ্ডে একজন ও আমেরিকায় একজন সন্ন্যাসী রাখিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য দেশেও প্রচারকার্যের জন্য আমার সন্ন্যাসী পাঠাইবার ইচ্ছা আছে।'

'ইংরেজ জাতি বড় কঠোর কর্মী। তাহাদিগকে যদি একটা ভাব দিতে পারা যায়, অর্থাৎ ঐ ভাবটি যদি তাহারা যথার্থ ধরিয়া থাকে, তবে নিশ্চিত জানিবেন, উহা বৃথা যাইবে না। এদেশের লোকে এখন বেদে জলাঞ্জলি দিয়াছে; সমুদয় ধর্ম ও দর্শন এখন এদেশে রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে। 'ছুঁৎমার্গ'ই ভারতের বর্তমান ধর্ম—এ ধর্ম ইংরেজ কোন কালেই লইবে না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাসমূহ এবং তাঁহারা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জগতে যে অপূর্ব তত্ত্বসমূহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক জাতিই গ্রহণ করিবে। ইংলিশ চার্চের বড় বড় মাতব্বররা বলিতেন, আমার চেষ্টায় বাইবেলের ভিতর বেদান্তের ভাব প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আধুনিক হিন্দুধর্ম আমাদের প্রাচীন ধর্মের অবনত ভাবমাত্র। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল যে-সকল দার্শনিক গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, সেগুলির মধ্যে এমন একখানিও নাই, যাহাতে আমাদের বৈদান্তিক ধর্মের কিছু-না-কিছু প্রসঙ্গ নাই। হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থে পর্যন্ত ঐরূপ আছে। এখন দর্শনরাজ্যে অদ্বৈতবাদেরই সময় আসিয়াছে। সকলেই এখন উহার কথা বলে। তবে ইওরোপের লোকেরা নিজেদের মৌলিকত্ব দেখাইতে চায়। এদিকে হিন্দুদের প্রতি তাহারা অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করে, কিন্তু আবার হিন্দুদের প্রচারিত সত্যগুলি লইতেও ছাড়ে না। অধ্যপক ম্যাক্সমূলার একজন পুরা বৈদান্তিক। তিনি বেদান্তের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। তিনি পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করেন।'

'আপনি ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করিতে ইচ্ছা করেন?'

‘আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। ঐ-সকল জাতি আমাদের শিক্ষার জন্য—রাজকর-রূপে পয়সা দিয়াছে। আমাদের ধর্মলাভের জন্য—শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই-সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথিই খাইয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ক্রীতদাস হইয়া আছে। ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদিগকে অবশ্যই কাজ করিতে হইবে। আমি যুবকগণকে ধর্মপ্রচারকরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য প্রথমে দুইটি কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় বা মঠ স্থাপন করিতে চাই—একটি মান্দ্রাজে ও অপরটি কলিকাতায়। কলিকাতারটি স্থাপন করিবার মত টাকার যোগাড় আমার আছে। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইংরেজরাই—বিদেশীরাই টাকা দিবে।’

‘উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্মী পাইব। তাহারাই সিংহবিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতিকল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে। বর্তমানে অনুষ্ঠেয় আদর্শটিকে আমি একটি সুনির্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছি। এবং উহা কার্যতঃ সফল করিবার জন্য আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদি আমি ঐ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ না করি, তাহা হইলে আমার পরে আমা অপেক্ষা কোন মহত্তর ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া উহা কার্যে পরিণত করিবেন। আমি উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। আমার মতে দেশের সর্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার প্রদান করিলেই বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান হইবে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অথচ দেশের সর্বসাধারণকে কেবল কতকগুলো ভুয়া জিনিষ দিয়াই আমরা চিরকাল ভুলাইয়া রাখিয়াছি। সম্মুখে অফুরন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত থাকিতেও আমরা তাহাদিগকে নালার জলমাত্র পান করিতে দিয়াছি। দেখুন না, মান্দ্রাজের গ্রাজুয়েটগণ একজন নিম্নজাতীয় লোককে স্পর্শ পর্যন্ত করিবে না, কিন্তু নিজেদের শিক্ষার সহায়তাকল্পে তাহাদের নিকট হইতে রাজকর বা অন্য কোন উপায়ে টাকা লইতে প্রস্তুত। আমি প্রথমেই ধর্মপ্রচারকগণের

শিক্ষার জন্য পূর্বোক্ত দুইটি শিক্ষালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি, এখানে সর্বসাধারণকে অধ্যাত্ম ও লৌকিক বিদ্যা—দুই-ই শেখান হইবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকগণ এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িবে—এইরূপে ক্রমে আমরা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িব। আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন—নিজের উপর বিশ্বাসী হওয়া; এমন কি—ভগবানে বিশ্বাস করিবারও পূর্বে সকলকে আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী আমরা দিন দিন এই আত্মবিশ্বাস হারাইতেছি। সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে ঐ জন্যই আমার এত আপত্তি। গোঁড়াদের ভাব অপরিণত হইলেও তাহাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস অনেক বেশী। সেজন্য তাহাদের মনের তেজও বেশী। কিন্তু এখানকার সংস্কারকেরা ইওরোপীয়দিগের হাতের পুতুল-মাত্র হইয়া তাহাদের অহমিকার পোষকতাই করিয়া থাকে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের জনসাধারণ দেবতাস্বরূপ। ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে দারিদ্র্য পাপ বলিয়া গণ্য নহে। নিম্নবর্ণের ভারতবাসীদেরও শরীর দেখিতে সুন্দর—তাহাদের মনেরও কমনীয়তা যথেষ্ট। কিন্তু অভিজাত আমরা তাহাদিগকে ক্রমাগত ঘৃণা করিয়া আসার দরুনই তাহারা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে। তাহারা মনে করে, তাহারা দাস হইয়াই জন্মিয়াছে। ন্যায্য অধিকার পাইলেই তাহারা নিজেদের উপর নির্ভর করিবে এবং উঠিয়া দাঁড়াইবে। জনসাধারণকে ঐরূপে অধিকার প্রদান করাই মার্কিন সভ্যতার মহত্ত্ব। হাঁটুভাঙা, অর্ধাশনক্লিষ্ট, হাতে একটা ছোট ছড়ি ও এক পুঁটলি কাপড়-চোপড় লইয়া সবেমাত্র জাহাজ হইতে আমেরিকায় নামিতেছে, এমন একজন আইরিশম্যানের আকৃতির সহিত কয়েক মাস আমেরিকায় বাসের পর তাহার আকৃতির তুলনা করুন। দেখিবেন, তাহার সেই সভয় ভাব গিয়াছে—সে সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কারণ, সে এমন দেশ হইতে আসিয়াছিল, যেখানে নিজেকে দাস বলিয়া জানিত; এখন এমন স্থানে আসিয়াছে, যেখানে সকলেই পরস্পর ভাই ভাই ও সমানাধিকারপ্রাপ্ত।'

'বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আত্মা অবিনাশী, অনন্ত ও সর্বশক্তিমান্। আমার বিশ্বাস, গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা

ধরুন। পঞ্চাশ বৎসর হইল ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ফল কি দাঁড়াইয়াছে? ঐগুলি একজনও মৌলিকভাবসম্পন্ন মানুষ তৈরী করিতে পারে নাই। এগুলি শুধু পরীক্ষাকেন্দ্ররূপে দণ্ডায়মান। সাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই।'

'মিসেস বেস্যাণ্ট ও থিওজফি সম্বন্ধে আপনার কি মত?'

' মিসেস বেস্যাণ্ট খুব ভাল লোক। আমি তাঁহার লণ্ডনের লজে৯ বক্তৃতা দিতে আহূত হইয়াছিলাম। সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তবে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বড় অল্প। তিনি এদিক ওদিক হইতে একটু আধটু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম আলোচনা করিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। তবে তিনি যে একজন অকপট মহিলা, এ-কথা তাঁহার পরম শত্রুও স্বীকার করিবে। ইংলণ্ডে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া পরিগণিত। তিনি একজন 'সন্ন্যাসিনী'। কিন্তু 'মহাত্মা' 'কুথুমি' প্রভৃতিতে আমি বিশ্বাসী নহি। তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির সংস্রব ছাড়িয়া দিন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যাহা সত্য মনে করেন, তাহা প্রচার করুন।'

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কথা পাড়িলে স্বামীজী বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নিজের মত এইভাবে প্রকাশ করিলেন, 'আমি এখনও এমন কোন জাতি দেখি নাই, যাহার উন্নতি বা শুভাশুভ তাহার বিধবাগণের পতিসংখ্যার উপর নির্ভর করে।'

আমাদের প্রতিনিধি জানিতেন, কয়েক জন ব্যক্তি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নীচের তলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি যে সংবাদপত্রের তরফ হইতে এইরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে অনুগ্রহপূর্বক সম্মত হইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমাদের প্রতিনিধি এইবার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৮. জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বোধন

['প্রবুদ্ধ ভারত', সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮]

সম্প্রতি 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জনৈক প্রতিনিধি কতকগুলি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি সেই আচার্যশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন—'স্বামীজী, আপনার মতে আপনার ধর্মপ্রচারের বিশেষত্ব কি?'

স্বামীজী প্রশ্ন শুনিবামাত্র উত্তর করিলেন, 'পরব্যূহভেদ (aggression); অবশ্য এই শব্দ কেবল আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। অন্যান্য সমাজ ও সম্প্রদায় ভারতের সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধের পর আমরাই প্রথম ভারতের সীমা লঙ্ঘন করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। '

'ভারতের পক্ষে আপনার ধর্মান্দোলন কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আপনি মনে করেন?'

'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার করা এবং জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিয়া দেওয়া। বর্তমানকালে 'হিন্দু' বলিতে ভারতের তিনটি সম্প্রদায় বুঝায়—প্রথম গোঁড়া বা গতানুগতিক সম্প্রদায়; দ্বিতীয় মুসলমান আমলের সংস্কারক-সম্প্রদায়সমূহ এবং তৃতীয় আধুনিক সংস্কারক-সম্প্রদায়সমূহ। আজকাল দেখি, উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সকল হিন্দু কেবল একটি বিষয়ে একমত—গোমাংস-ভোজনে সকল হিন্দুরই আপত্তি।'

'বেদবিশ্বাসে কি সকলেই একমত নহে?'

‘মোটেই না। ঠিক এইটিই আমরা পুনরায় জাগাইতে চাই। ভারত এখনও বুদ্ধের ভাব আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া প্রাচীন ভারত মুগ্ধই হইয়াছিল, নব বলে সঞ্জীবিত হয় নাই।’

‘বর্তমানকালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আপনি কি কি বিষয়ে প্রতিভাত দেখিতেছেন?‘

‘বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তো সর্বত্রই জাজ্বল্যমান। আপনি দেখিবেন—ভারত কখনও কোন কিছু পাইয়া হারায় না, কেবল উহা আয়ত্ত করিতে—নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে সময়ের প্রয়োজন হয়। বুদ্ধ যজ্ঞে প্রাণিবধের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, ভারত সেই ভাব আর ফেলিয়া দিতে পারে নাই। বুদ্ধ বলিলেন, ‘গো-বধ করিও না’; এখন দেখুন আমাদের পক্ষে গো-বধ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।’

‘ স্বামীজী, আপনি পূর্বে যে তিন সম্প্রদায়ের নাম করিলেন, তন্মধ্যে আপনি নিজেকে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘আমি সকল সম্প্রদায়ের। আমরাই সনাতন হিন্দু। ’

এই কথা বলিয়াই তিনি সহসা প্রবল আবেগভরে ও গম্ভীরভাবে বলিলেন, ‘কিন্তু ছুঁৎমার্গের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। উহা হিন্দুধর্ম নহে, উহা আমাদের কোন শাস্ত্রে নাই। উহা প্রাচীন আচারের অননুমোদিত একটি কুসংস্কার—আর চিরদিনই উহা জাতীয় অভ্যুদয়ে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।’

‘তাহা হইলে আপনি আসলে চান জাতীয় অভ্যুদয়?’

‘নিশ্চয়। ভারত কেন সমগ্র আর্যজাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, তাহার কি কোন যুক্তি আপনি নির্দেশ করিতে পারেন? ভারত কি বুদ্ধিবৃত্তিহীন?—কলাকৌশলহীন? উহার শিল্প, উহার গণিত, উহার দর্শনের দিকে দেখিলে আপনি কি উহাকে কোন বিষয়ে হীন বলিতে পারেন? কেবল প্রয়োজন এইটুকু যে, তাহাকে মোহনিদ্রা হইতে—শত শত শতাব্দীব্যাপী

দীর্ঘ নিদ্রা হইতে–জাগিতে হইবে এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির মধ্যে তাহাকে তাহার প্রকৃত স্থান গ্রহণ করিতে হইবে।'

'কিন্তু ভারত চিরদিনই গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। উহাকে কার্য-কুশল করিবার চেষ্টা করিতে গেলে উহা নিজের একমাত্র সম্বল–ধর্মরূপ পরম ধন হারাইতে পারে, আপনার এরূপ আশঙ্কা হয় না কি?'

'কিছুমাত্র না। অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এতদিন ধরিয়া ভারতে আধ্যাত্মিক বা অন্তর্জীবন এবং পাশ্চাত্যদেশে বাহ্যজীবন বা কর্মকুশলতা বিকাশ পাইয়া আসিয়াছে। এ পর্যন্ত উভয়ে বিপরীত পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল; এখন উভয়ের সম্মিলন-কাল উপস্থিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস গভীর-অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু বহির্জগতেও তাঁহার মত কর্মতৎপরতা আর কাহার আছে? ইহাই রহস্য। জীবন–সমুদ্রের মত গভীর হইবে বটে, আবার আকাশের মত বিশাল হওয়াও চাই।'

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'আশ্চর্যের বিষয়, অনেক সময় দেখা যায়, বাহিরে পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি সঙ্কীর্ণতার পরিপোষক ও উন্নতির প্রতিকূল হইলেও আধ্যাত্মিক জীবন খুব গভীরভাবে বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই বিপরীত ভাবের পরস্পর একত্র অবস্থান আকস্মিক মাত্র, অপরিহার্য নহে। আর যদি আমরা ভারতে ইহার সমাধান করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎও ঠিক পথে চলিবে। কারণ, মূলে আমরা সকলেই কি এক নহি?'

'স্বামীজী, আপনার শেষ মন্তব্যগুলি শুনিয়া আর একটি প্রশ্ন মনে উদিত হইতেছে। এই প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়?'

স্বামীজী বলিলেন, 'এ বিষয়ের মীমাংসার ভার আমার নহে। আমি কখনও কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রচার করি নাই। আমার নিজের জীবন এই মহাত্মার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাভক্তিবশে পরিচালিত, কিন্তু অপরে আমার এই ভাব কতদূর গ্রহণ করিবে, তাহা তাহারা নিজেরাই স্থির করিবে। যতই বড় হউক, কেবল একটি নির্দিষ্ট জীবনঘাত দিয়াই

চিরকাল পৃথিবীতে ঐশীশক্তি-স্রোত প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেক যুগকে নূতন করিয়া আবার ঐ শক্তি লাভ করিতে হইবে। আমরা কি সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ নই?'

'ধন্যবাদ। আপনাকে আর একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আপনি স্বজাতির জন্য আপনার প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ঐরূপ সমগ্রভাবে আপনার কর্মপদ্ধতি এখন বর্ণনা করিবেন কি?'

স্বামীজী বলিলেন, 'আমাদের কার্যপ্রণালী অতি সহজেই বর্ণিত হইতে পারে। ঐ প্রণালী আর কিছুই নহে—কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিল। ইহাই রহস্য। 'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা হইতেই উন্নত হইবে। এদেশে ধর্মের পতাকা যতই উচ্চে তুলিয়া ধরা হউক, কিছুতেই পর্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।'

৯. ভারতীয় নারী—তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

['প্রবুদ্ধ ভারত', ডিসেম্বর, ১৮৯৮]

ভারতের নারীগণের অবস্থা ও অধিকার এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য হিমালয়ের একটি সুন্দর উপত্যকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। স্বামীজীর নিকট যখন আমার আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, 'চলুন, একটু বেড়াইয়া আসা যাক।' তখনই আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম।

কিছুক্ষণ পরে তিনি মৌনভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'নারীর সম্বন্ধে আর্য ও সেমিটিক আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত! সেমাইটদের মধ্যে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের মতে স্ত্রীলোকের কোনরূপ ধর্মকর্মে অধিকার নাই, এমন কি, আহারের জন্য পক্ষী বলি দেওয়াও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর্যদের মতে সহধর্মিণী ব্যতীত পুরুষ কোন ধর্মকার্য করিতে পারে না।

আমি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও স্পষ্ট কথায় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলাম, 'কিন্তু স্বামীজী, হিন্দুধর্ম কি আর্যধর্মেরই অঙ্গবিশেষ নহে?'

স্বামীজী ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আধুনিক হিন্দুধর্ম পৌরাণিক-ভাববহুল, অর্থাৎ উহার উৎপত্তিকাল বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী। দয়ানন্দ সরস্বতী দেখাইয়া দিয়াছেনঃ গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতিদানরূপ বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে সহধর্মিণী ব্যতীত হইতে পারে না, তাহারই আবার শালগ্রামশিলা অথবা গৃহদেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই; ইহার কারণ এই যে, এই-সকল পূজা পরবর্তী পৌরাণিক যুগ হইতে প্রচলিত হইয়াছে।'

‘তাহা হইলে আমাদের মধ্যে নরনারীর যে অধিকার-বৈষম্য দেখা যায়, তাহা আপনি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবসম্ভূত বলিয়া মনে করেন?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘যদি কোথাও বাস্তবিকই অধিকার-বৈষম্য থাকে, সেক্ষেত্রে আমি ঐরূপই মনে করি। পাশ্চাত্য সমালোচনার আকস্মিক স্রোতে এবং তুলনায় পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থাবৈষম্য দেখিয়াই যেন আমরা আমাদের দেশে নারীদের হীন দশা অতি সহজেই মানিয়া না লই। বহু শতাব্দীর বহু ঘটনা বিপর্যয়ের দ্বারা নারীদিগকে একটু আড়ালে রাখিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সামাজিক রীতিনীতি পরীক্ষা করিতে হইবে, স্ত্রীজাতির হীন অবস্থা বিচার করিয়া নহে!’

‘তাহা হইলে স্বামীজী, আমাদের সমাজে নারীগণের বর্তমান অবস্থায় কি আপনি সন্তুষ্ট?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘না কখনই নহে। কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মত আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা-লাভে সমর্থ।’

‘আপনি নারীজাতির অধিকার-বৈষম্যের কারণ বলিয়া বৌদ্ধধর্মের উপরে দোষারোপ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, বৌদ্ধধর্ম কিরূপে নারীজাতির অবনতির কারণ হইল?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘ সেই কারণের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক আন্দোলনেই কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই তাহার জয় ও অভ্যুদয় হয়, কিন্তু আবার উহার অবনতির সময়, যাহা লইয়া তাহার গৌরব, তাহাই তাহার দুর্বলতার প্রধান উপাদান হয়। নরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধের সম্প্রদায়গঠন ও পরিচালন-শক্তি অদ্ভুত ছিল, আর ঐ শক্তিতে তিনি জগৎ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম কেবল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের উপযোগী ধর্ম। তাহা হইতে এই অশুভ ফল হইল যে, সন্ন্যাসীর ভেক্

পর্যন্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। আবার তিনিই সর্বপ্রথম মঠপ্রথা অর্থাৎ এক ধর্মসঙ্ঘে বাস করিবার প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নারীজাতিকে পুরুষ অপেক্ষা নিম্নাধিকার দিতে হইল, যেহেতু বড় বড় মঠাধ্যক্ষাও নির্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিষ্ট আশু ফললাভ, অর্থাৎ তাঁহার ধর্মসঙ্ঘের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল সুদূর ভবিষ্যতে ইহার যে ফল হইয়াছিল, তাহারই জন্য অনুশোচনা করিতে হয়।'

'কিন্তু বেদে তো সন্ন্যাসের বিধি আছে?'

'অবশ্যই আছে, কিন্তু সে-সময় ঐ বিষয়ে নরনারীর কোন প্রভেদ করা হয় না। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনক-রাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহা আপনার স্মরণ আছে তো?১০ তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্ত্রী ছিলেন বাক্‌পটু কুমারী বাচক্নবী। সেকালে এইরূপ মহিলাকে 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার এই প্রশ্নদ্বয় দক্ষ ধানুষ্কের হস্তস্থিত দুইটি শাণিত তীরের মতো'; এই স্থলে তাঁহার নারীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তোলা হয় নাই। আমাদের প্রাচীন আরণ্য-শিক্ষাকেন্দ্রে বালকবালিকার যে সমানাধিকার ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর সাম্য আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত নাটকগুলি পড়ুন—শকুন্তলার উপাখ্যান পড়ুন, তারপর দেখুন—টেনিসনের 'প্রিন্সেস্' হইতে আমাদের নূতন কিছু শিখিবার আছে কিনা।'

'স্বামীজী, আপনি বড় অদ্ভুতরূপে আমাদের অতীতের মহিমা-গৌরব সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন!'

স্বামীজী শান্তভাবে বলিলেন—' হাঁ, তাহার কারণ সম্ভবতঃ আমি জগতের দুইটি দিকই দেখিয়াছি। আর আমি জানি, যে-জাতি সীতা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে—ঐ চরিত্র যদি কাল্পনিকও হয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, নারীজাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই। পাশ্চাত্য মহিলাদের জন্য আইনের যে-সব বজ্রবাঁধন

আছে, আমাদের দেশের লোক সে-সব জানেও না। আমাদের নিশ্চয়ই অনেক দোষ আছে, আমাদের সমাজে অনেক অন্যায়ও আছে, কিন্তু এই-সকল উহাদেরও আছে। আমাদের এটি কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সমগ্র জগতে প্রেম কোমলতা ও সাধুতা বাহিরের কার্যে ব্যক্ত করিবার একটা সাধারণ চেষ্টা চলিয়াছে, আর বিভিন্ন জাতীয় প্রথাগুলির দ্বারা যতটা সম্ভব ঐ-ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। গার্হস্থ্য ধর্ম সম্বন্ধে আমি এ-কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, অন্যান্য দেশের প্রথাসমূহ অপেক্ষা ভারতীয় প্রথাসমূহের নানাভাবে অধিকতর উপযোগিতা রহিয়াছে।'

'তবে স্বামীজী, আমাদের মেয়েদের কোনরূপ সমস্যা আদৌ আছে কি—যাহার মীমাংসা প্রয়োজন?'

'অবশ্যই আছে—অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা'—এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে উদিত হয় নাই।'

'তাহা হইলে আপনি প্রকৃত শিক্ষার কি সংজ্ঞা দিবেন?'

স্বামীজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'আমি কখনও কোন-কিছুর সংজ্ঞা নির্দেশ করি না। তথাপি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির—শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমন ভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল হয়। এইভাবে শিক্ষিতা হইলে ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থ নির্ভীক মহীয়সী নারীর অভ্যুদয় হইবে। তাঁহারা সঙ্ঘমিত্তা, লীলা, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ-এর পদাঙ্ক-অনুসরণে সমর্থ হইবেন, তাঁহারা পবিত্র স্বার্থশূন্য বীর হইবেন। ভগবানের পাদপদ্মস্পর্শে যে বীর্য লাভ হয়, তাঁহারা সেই বীর্য লাভ করিবেন, সুতরাং তাঁহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্যা হইবেন।'

'তাহা হইলে স্বামীজী, শিক্ষার ভিতর ধর্মশিক্ষাও কিছু থাকা উচিত, আপনি মনে করেন?'

স্বামীজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিষ বলিয়া মনে করি। এটি কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্মসম্বন্ধে মতামতকে 'ধর্ম' বলিতেছি না। আমার বিবেচনায় অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ বিষয়েও তেমনি শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর ভাব ও ধারণানুযায়ী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাহাকে উন্নত করিবার এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন, যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে হয়।'

'কিন্তু ধর্মের দৃষ্টিতে, ব্রহ্মচর্যকে বাড়াইয়া জননী ও সহধর্মিণী অপেক্ষা যাঁহারা এইসব সম্বন্ধ এড়াইয়া ব্রহ্মচারিণী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে উচ্চাসন দেওয়া নিশ্চয়ই নারীর উন্নতিতে সোজাসুজি আঘাত করা?'

স্বামীজী বলিলেন–'আপনার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ধর্ম যদি নারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্যকে উচ্চাসন দিয়া থাকে, পুরুষজাতির পক্ষেও ঠিক তাহাই করিয়াছে। আরও আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে আপনার নিজের মনেও যেন একটু কি গোলমাল আছে। হিন্দুধর্ম মানবাত্মার পক্ষে একটি–কেবল একটি কর্তব্য নির্দেশ করিয়া থাকেন–অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তু সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা। কিন্তু ইহা কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার একমাত্র পন্থা নির্দেশ করিতে কেহই সাহসী হন না। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য, ভাল বা মন্দ, পাণ্ডিত্য বা মূর্খতা–যে-কোন বিষয় ঐ চরম লক্ষ্যে লইয়া যাইবার সহায়তা করে, তাহারই সার্থকতা আছে। এই বিষয়ে হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভেদ বর্তমান। কারণ বৌদ্ধধর্মের প্রধান উপদেশ–বহির্জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি, আর মোটামুটি বলিতে গেলে ঐ উপলব্ধি একটিমাত্র উপায়েই সাধিত হইতে পারে। মহাভারতের সেই অল্পবয়স্ক যোগীর কথা–আপনার কি মনে পড়ে? ইনি ক্রোধজাত তীব্র ইচ্ছাশক্তিবলে এক কাক ও বকের দেহ ভস্ম করিয়া নিজ যোগবিভূতিতে স্পর্ধান্বিত হইয়াছিলেন, তারপর নগরে গিয়া প্রথমে রুগ্ন পতির শুশ্রুষাকারিণী এক নারীর সহিত, পরে ধর্মব্যাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল–যাঁহারা উভয়েই নিষ্ঠা ও কর্তব্যরূপ একই মার্গ অবলম্বনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন?' ১১

‘তাহা হইলে আপনি এদেশের নারীগণকে কি বলিতে চান?’

‘কেন, আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের অপরকে দিবার জিনিষ সহস্রগুণ বেশী আছে।’

১০. হিন্দুধর্মের সীমানা

['প্রবুদ্ধ ভারত', এপ্রিল, ১৮৯৯]

আমাদের প্রতিনিধি লিখিতেছেন, অন্যধর্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্মে আনা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য সম্পাদকের আদেশে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের পোস্তার নিকট নৌকা লাগাইয়াছি। স্বামীজী মঠ হইতে নৌকায় আসিয়া আমার সহিত কথাবার্তা কহিতে আসিলেন। গঙ্গাবক্ষে নৌকার ছাদে বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ মিলিল।

আমিই প্রথমে কথা বলিলাম, ' স্বামীজী, যাহারা হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে পুনর্গ্রহণ-বিষয়ে আপনার মতামত কি জানিবার জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আপনার কি মত, তাহাদিগকে আবার গ্রহণ করা যাইতে পারে?'

স্বামীজী বলিলেন, 'নিশ্চয়। তাহাদের অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে, করা উচিতও।'

তিনি মুহূর্তকাল গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন–

'আর এক কথা তাহাদিগকে পুনর্গ্রহণ না করিলে আমাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে। যখন মুসলমানেরা প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমানের ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। আর, কোন লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নয়, একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়!

'তারপর আবার হিন্দুধর্মত্যাগী মুসলমান বা খ্রীষ্টানের মধ্যে অধিকাংশই তরবারিবলে ঐ-সব ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, অথবা যাহারা ইতঃপূর্বে ঐরূপ করিয়াছে, তাহাদেরই বংশধর। ইহাদিগের হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিবার পক্ষে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করা বা

প্রতিবন্ধকতা করা স্পষ্টতই অন্যায়। আর যাহারা কোনকালে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিল না, তাহাদের সম্বন্ধেও কি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? দেখুন না, অতীতকালে এইরূপ লক্ষ লক্ষ বিধর্মীকে হিন্দুধর্মে আনা হইয়াছে, আর এখনও সেরূপ চলিতেছে।

‘আমার নিজের মত এই যে, ভারতের আদিবাসিগণ, বহিরাগত জাতিসমূহ এবং মুসলমানাধিকারের পূর্ববর্তী আমাদের প্রায় সকল বিজেতৃবর্গের পক্ষেই ঐ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, পুরাণসমূহে যে-সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমার মতে তাহারা অন্যধর্মী ছিল, তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া হইয়াছে।

‘যাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে চায়, তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-ক্রিয়া আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল—যেমন কাশ্মীর ও নেপালে অনেককে দেখা যায়, অথবা যাহারা কখনও হিন্দু ছিল না, এখন হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করা উচিত নহে।’

সাহসপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘স্বামীজী, কিন্তু ইহারা কোন্ জাতি হইবে? তাহাদের কোন-না-কোনরূপ জাতি থাকা আবশ্যক, নতুবা তাহারা কখনও বিশাল হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইতে পারিবে না। হিন্দুসমাজে তাহাদের যথার্থ স্থান কোথায়?’

স্বামীজী ধীরভাবে বলিলেন, ‘যাহারা পূর্বে হিন্দু ছিল, তাহারা অবশ্য তাহাদের জাতি ফিরিয়া পাইবে। আর যাহারা নূতন, তাহারা নিজের জাতি নিজেরাই করিয়া লইবে।’

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, ‘স্মরণ রাখিবেন, বৈষ্ণব-সমাজে ইতঃপূর্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং অহিন্দু ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন জাতি হইতে যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, সকলেই বৈষ্ণব-সমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া নিজেদেরই একটা জাতি গঠন করিয়া লইয়াছিল, আর সে-জাতি বড় হীন জাতি নহে, বেশ ভদ্র জাতি। রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলাদেশে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকল বড় বড় বৈষ্ণব আচার্যই ইহা করিয়াছেন।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘এই নূতন যাহারা আসিবে, তাহাদের বিবাহ কোথায় হইবে?’

স্বামীজী স্থিরভাবে বলিলেন, ‘এখন যেমন চলিতেছে, নিজেদের মধ্যেই।’

আমি বলিলাম, ‘তারপর নামের কথা। আমার বোধ হয়, অহিন্দু এবং যে-সব স্বধর্মত্যাগী অহিন্দু নাম লইয়াছিল, তাহাদের নূতন নামকরণ করা উচিত। তাহাদিগকে কি জাতিসূচক নাম বা আর কোনপ্রকার নাম দেওয়া যাইবে?’

স্বামীজী চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, ‘অবশ্য নামের অনেকটা শক্তি আছে বটে।’

কিন্তু তিনি এই বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলেন না। কিন্তু তারপর আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাঁহার আগ্রহ যেন উদ্দীপ্ত হইল। প্রশ্ন করিলাম—‘স্বামীজী, এই নব আগন্তুকগণ কি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন প্রকার শাখা হইতে নিজেদের ধর্মপ্রণালী নিজেরাই নির্বাচন করিয়া লইবে, অথবা আপনি তাহাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট ধর্মপ্রণালী নির্বাচন করিয়া দিবেন?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘এ-কথা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাহারা আপনাপন পথ নিজেরাই বাছিয়া লইবে। কারণ নিজে নির্বাচন করিয়া না লইলে হিন্দুধর্মের মূলভাবটিই নষ্ট করা হয়। আমাদের ধর্মের সার এইটুকু যে, প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্ট-নির্বাচনের অধিকার আছে।’

আমি এই কথাটি বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিলাম। কারণ আমার বোধ হয়, আমার সম্মুখস্থ এই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের আলোচনায় অনেক দিন কাটাইয়াছিলাম আর ইষ্ট-নির্বাচনের স্বাধীনতারূপ তত্ত্বটি এত উদার যে, সমগ্র জগৎকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।